অদ্ভুতুড়ে সিরিজ
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
কুঞ্জপুকুরের
কাণ্ড

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
কুঞ্জপুকুরের
কাণ্ড

কুঞ্জপুকুরের কাণ্ড

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

শশীদাদুর হাতটা যতদিন ক্রিয়াশীল ছিল, ততদিন এলাকাটা ছিল শান্তির জায়গা। চোর, ডাকাত, গুণ্ডাদের উৎপাত ছিল না । কেউ কোনও অন্যায় কাজ করার আগে দুবার ভাবত আইনশৃঙ্খলার অবস্থা ছিল খুবই ভাল। সবাই বলত, কুঞ্জপুকুরের মতো এমন নিরাপদ জায়গা আর হয় না।

কিন্তু শশীদাদুর হাত ঝিমিয়ে পড়ার পর থেকেই কুঞ্জপুকুরের আশপাশে যেন পাজি-বদমাশদের মাথাচাড়া দেওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সবই অবশ্য ছোটখাটো ঘটনা, আমল না দিলেও চলে কিন্তু এগুলো হচ্ছে পূর্বলক্ষণ। চোর-বদমাশরা একটু বাজিয়ে দেখছে পরিস্থিতিটা। এই তো সেদিন হাফিজুল মিঞা হরিপুরের হাট থেকে সন্ধের পর ফিরছিল । রাম দত্তর বাঁশবনের ভেতর দিয়ে আসার সময় কে যেন তার মাথার চুবড়ি থেকে টুক করে ডালের পোটলাটা সরিয়ে ফেলল। আবার দিন-দুই পরেই হরিবল্লভ রায় বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। বড় ঝিলের ধারে দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন, হঠাৎ একটা মুষকো মতো লোক কোথা থেকে এসে তাঁর হাতের রুপোর বাঁধানো লাঠিখানা কেড়ে নিয়ে হাওয়া!

সরকারবাড়ির ঘটনাটাও খারাপ। সেদিন মাঝরাতে সরকারবাড়ির একতলার জানলা ভেঙে চোর ঢুকেছিল। লোকজন উঠে পড়ায় বেশি কিছু নিতে পারেনি, দুটো কাসার থালার ওপর দিয়ে গেছে।

কিন্তু কথা হল, শশীদাদুর হাত যদি ক্রিয়াশীল থাকত, তা হলে এসব হতেই পারত না। কুঞ্জপুকুরের মোড়ল-মুরুব্বিরা এবং আশপাশের সাত গাঁয়ের লোক চিন্তায় পড়ে গেছে। ঘন-ঘন সবাই বৈঠকেও বসছে। নন্দ কবিরাজকেও ডাকা হয়েছে বৈঠকে। নন্দ কবিরাজ বলছে, "শশীখুড়োর বয়স এই একশো সাত পুরে একশো আট বছর চলছে। এত বয়সের মানুষ সম্পর্কে কোনও ভরসা দেওয়া যায় না। তবে আমি সাধ্যমতো চিকিৎসা করে যাচ্ছি। দেখা যাক কী হয়?"

শশীদাদু থাকেন একখানা খোলামেলা ঘরে। পাশেই মস্ত বাগান, হরেক ফুল, হরেক গাছ সেখানে। শশীদাদুর ঘরে মস্ত-মস্ত জানলা। অনেক আলো-হাওয়া খেলে। জানলার পাশেই একটা মস্ত চৌকিতে শশীদাদু শুয়ে থাকেন সারাদিন। মস্ত চুল আর দাড়ি, সব সাদা ধবধব করছে। শশীদাদুর গায়ের রঙও খুব ফরসা, লম্বা শীর্ণ চেহারা। ক'দিন আগেও তিনি যুবকের মতো দ্রুতপায়ে এ-গাঁ ও-গাঁ ঘুরে বেড়াতেন। সকলের খোঁজখবর করতেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন হল, কোনও অসুখেই হোক, বা বার্ধক্যের জন্যই হোক, উনি একেবারে শয্যা নিয়েছেন। কারও সঙ্গে কথা বলেন না। সবসময়ে চোখ বোজা। ডাকলে সাড়া দেওয়া দূরের কথা, চোখ মেলে তাকান না পর্যন্ত। শশীদাদুর মেয়ে বিধবা ক্ষান্তমণিই তাঁকে আগলে রাখে।

শশীদাদু শয্যা নেওয়াতে সকলেরই মনখারাপ। বিশেষ করে গাঁয়ের ছেলেপুলেরা। শশীদাদু রোববারে চণ্ডীমণ্ডপে বাচ্চাদের নিয়ে ভারি ভাল একটা আসর জমাতেন। তাতে গল্প, ম্যাজিক, ধাঁধা, কত কী হত! সব বন্ধ হয়ে আছে।

আর শশীদাদুর সেই বিখ্যাত হাতখানাও বিছানার পাশে একটা টেবিলের ওপর পড়ে আছে চুপচাপ। নড়েও না, চড়েও না।

হাতটা দেখতে হাত-ভরা একটা দস্তানার মতো। সলিড জিনিস। সাইজেও বেশ বড়, সাধারণ মানুষের পাঞ্জার দেড়গুণ হবে। কবজির কাছটা কাটা। কাটা অংশের কোনও ফাঁকফোকর নেই। যেন রবারে তৈরি জিনিস। রঙখানা ধবধব করছে সাদা।

ইতিবৃত্তান্ত কেউ কিন্তু জানে না। শশীদাদু কখনও কিছু বলেন না। হাতটা নিয়ে প্রশ্ন করলে মিটিমিটি হাসেন আর বলেন, "দুনিয়ায় কত আশ্চর্য ব্যাপার আছে!"

হাতটা নিয়ে গাঁয়ে নানা কথা প্রচলিত আছে। হরিবল্লভ রায় বলেন, "শশীখুড়ো ভবঘুরে লোক। সারা পৃথিবী চষে বেরিয়েছেন। জাহাজে, এরোপ্লেনে, রেলগাড়িতে, মোটরে. সাইকেলে আর পায়ে হেঁটে কোনও জায়গা বাকি রাখেননি। দুর্গম সব অঞ্চলে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ঘুরতেন। একবার আল্‌পস পাহাড়ে ওঠার সময় একজন পর্বতারোহীকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন। পর্বতারোহী এক সাহেব! পাহাড়ের একটা খাঁজ ধরে ঝুলছিল। শশীখুড়ো তার ডান হাতখানা শক্ত করে ধরে যখন টেনে তুলবার চেষ্টা করছিলেন তখন বুঝতে পারেননি যে, সাহেব আসলে অনেকক্ষণ আগেই ঠাণ্ডায় জমে মারা গেছে। হাতটা ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে যাওয়ায় দেহটা পড়ে যায়নি। কিন্তু যেই শশীখুড়ো টেনে তুলতে গেলেন, তখনই টানা-হ্যাঁচড়ায় হাতটা শরীর থেকে খসে এল। সাহেবও পড়ে গেল নিচে। তবে হয়েছিল কী, সাহেবের আত্মাটা আশপাশেই ঘুরঘুর করছিল। শরীরের একটা মায়া আছে তো, সহজে ছাড়তে চায় না।

আত্মাটার খুব ইচ্ছে ছিল শরীরে আবার ঢুকে পড়ে। কিন্তু শরীরটা পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়ায় আত্মাটা তখন বাধ্য হয়ে হাতটার মধ্যেই ঢুকে পড়ল।"

দিনু সরকার অবশ্য বলেন, "ওরে না, না। ও গল্প ঠিক নয়। শশী জ্যাঠার যৌবনে গায়ে ছিল পেল্লায় জোর। আমরাও দেখেছি, শশী জ্যাঠা একবার একটি বড় আমগাছ স্রেফ জাপটে ধরে টেনে উপড়ে ফেললেন। একবার তো ঢেঁকি তুলে সেইটে বনবন করে ঘোরাতে-ঘোরাতে একদল ডাকাতকে তাড়া করেছিলেন। তা হয়েছিল কী, সেবার আফ্রিকার জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে এক মস্ত গরিলার মুখে পড়ে গিয়েছিলেন। শশীজ্যাঠা তার সঙ্গে ঝগড়া-কাজিয়ায় না গিয়ে বন্ধুত্ব পাতাতে হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন, বললেন, মিস্টার গরিলা, হাউ আর ইউ? কিন্তু গরিলাটা ছিল তাঁদড়। হ্যান্ডশেক করার ভান করে সে শশী জ্যাঠার হাত ধরে এমন হ্যাঁচকা টান মারল যে, শশীজ্যাঠা উলটে পড়লেন। তারপর আবার শশীজ্যাঠাকে হাত ধরে আর-একটা আছাড় মেরেছিল সে। শশীজ্যাঠার খুব রাগ হল। গরিলার এত সাহস ! তিনিও তখন দিলেন হ্যাঁচকা টান। ব্যস, গরিলার হাত কবজি থেকে খসে শশী জ্যাঠার হাতে চলে এল, আর গরিলা ব্যাটা 'বাপ রে, মা রে' বলে চেঁচাতে-চেঁচাতে হাওয়া! শশীজ্যাঠা হাতটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দেন। অনেকদিন বাদে গরিলাটা মারা যায়। তার আত্মাটা

শশী জ্যাঠার কাছে ক্ষমা চাইতে আসে। তখন শশী জ্যাঠা আত্মাটাকে ওই হাতটার মধ্যে ভরে রাখেন।”

রতন বোস বিজ্ঞানের শিক্ষক, তিনি এসব গল্প শুনে নাক সিটকে বলেন, “ভূতপ্রেত, আত্মা বলে কিছু নেই। ওসব গাঁজাখুরি গল্প। আসলে হাতটা হল রোবট। পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলার একজন ইহুদি বৈজ্ঞানিককে আটক করে খুব অত্যাচার করেন। তারপর তাকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে একটা আবিষ্কারের কাজে লাগান। হিটলারের খুব ইচ্ছে ছিল, চার্চিলের মোটা নাকে কষে একখানা ঘুসি বসান। কিন্তু চার্চিলের নাক তো আর তাঁর নাগালের মধ্যে নয়। তাই ওই হাতখানা তাঁর দরকার ছিল। ইহুদিদের বিজ্ঞানে খুব মাথা। সেই বৈজ্ঞানিক কয়েক মাসের চেষ্টায় এই আশ্চর্য হাত আবিষ্কার করে ফেললেন। কিন্তু বিপদ হল, একদিন হিটলার যখন বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরিতে হাতটা কতদূর হল জানতে গেছেন, তখন হাতটা পট করে লাফিয়ে উঠে হিটলারের নাকেই একখানা ঘুসি বসিয়ে দেয়। হিটলার তো প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বৈজ্ঞানিককে পাঠিয়ে দিলেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। হাতখানা ছুড়ে ফেলে দিলেন ডাস্টবিনে। শশীদা তখন জার্মানিতেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

যুদ্ধের বেড়াজালে আটকে পড়ে পালানোর পথ খুঁজছেন। হাতটা তিনিই একদিন কুড়িয়ে পেলেন। হাতটা যে সামান্য নয়, তা বুঝতে তাঁর দেরি হয়নি। হিটলার যে এরকম একটা কিছু আবিষ্কার করতে একজন বৈজ্ঞানিককে লাগিয়েছিলেন, তাও শুনেছিলেন। তখন তিনি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নাৎসি সোলজার সেজে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে গিয়ে সেই বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে দেখাও করেন। বৈজ্ঞানিক তাকে হাত সম্পর্কে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দেন। তবে তিনিও হাতটার কার্যকারিতা যে কতটা, তা ভাল করে বুঝে উঠতে পারেননি। দুঃখের বিষয়, সেই বৈজ্ঞানিককে সেইদিনই গ্যাস চেম্বারে পাঠানো হয়। হাতটার এলেম বুঝতে এবং শিখতে শশীদার আরও কয়েকদিন সময় লেগেছিল নইলে ওই হাত দিয়েই বৈজ্ঞানিককে উদ্ধার করতে পারতেন। শুধু তাই নয়, ওই হাতখানা দিয়েই হিটলারকে তাঁর নাৎসিবাহিনী-সহ জব্দ করা যেত।”

কুঞ্জপুকুরের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটি হলেন মহিম ঘোষ। একশো পনেরো পার হয়ে ষোলোয় পড়েছেন। তিনি বলেন, "ওরে, চার্চিলের নাকখানাই এমন যে, সকলেরই ঘুসি মারতে ইচ্ছে করবে। তাই বলে ওই রোবটের গল্পটা আবার তোরা বিশ্বাস করে বসিসনি ও কার হাত, সবাই না জানলেও আমি জানি। জাদুকর রাখহরি মজুমদার ছিলেন নমস্য পুরুষ। কী যে মারাত্মক খেলা দেখাতেন, তা বলার নয়। অশৈলী সব কাণ্ডকারখানা। সাগরদিঘির জল এক চুমুকে খেয়ে ফেললেন। আকাশে সবুজ মেঘ ভাসিয়ে আনলেন। শূন্যে পায়চারি করা তো ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। হাতখানা তাঁরই রাখহরি মজুমদার শেষ যে-খেলাটা দেখিয়েছিলেন সেটা হয়েছিল ওই কুঞ্জপুকুরেই। হাই স্কুলের মাঠে শামিয়ান টাঙিয়ে খেলা হচ্ছিল। দুর্দান্ত-দুর্দান্ত সব ম্যাজিক দেখানোর পর বললেন,

"এইবার আমার শেষ খেলা।" বলে স্টেজের মাঝখানে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর একে-একে তাঁর সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খসে-খসে পড়ে যেতে লাগল, মুণ্ডু গেল, হাত গেল, পা গেল, বুক আর পেট কিছুক্ষণ শূন্যে ভেসে থেকে তারপর খসে পড়ল। শুধু গলার স্বরটা শোনা গেল, রাখহরি বলছিলেন, "আমার মৃত্যু নেই। আমি পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলাম বাস্তবিকই তাই, আমরা হুড়মুড় করে স্টেজে উঠে দেখলাম, একমাত্র ডান হাতের পাঞ্জাখানা ছাড়া আর কিছুই নেই। সব অদৃশ্য। রাখহরিকে আর পৃথিবীতে দেখাও যায়নি কখনও। ওই হাতখানা গোলেমালে কুড়িয়ে নিয়েছিল আমাদের শশীভায়া। তাতে দস্তানা পরিয়ে নিয়েছে, এই যা। রাখহরি মজুমদারই এই হাতখানায় মাঝে-মাঝে ভর করে।"

শশীদাদুর হাত নিয়ে আরও নানা ধরনের গল্প প্রচলিত আছে। কোনটা সত্যি, কোনটা নয়, কে বলবে? হাতের রহস্য যা-ই হোক, হাতটা এখানকার মানুষের পরম বন্ধু। কেউ কোনও মুশকিলে পড়ে শশীদাদুর কাছে গিয়ে হাজির হলেই হল, শশীদাদু অমনই তাঁর হাতটাকে মুশকিল আসান করতে পাঠিয়ে দিতেন।

ওস্তাদ বিলু খাঁ সেবার পাশের গাঁ হরিহরপুরে জমিদারবাড়িতে গান গাইতে এলেন। কিন্তু গানের দিন সকাল থেকেই তাঁর তবলচির ম্যালেরিয়া। সে কাঁপতে-কাঁপতে সাতখানা লেপ চাপা দিয়ে চিঁ-চিঁ করছে। অথচ এদিকে আসর-ভর্তি সব গণ্যমান্য লোক। বহু দূর-দূর থেকে সব এসেছেন। কিন্তু তবলচি ছাড়া গান হবেই বা কী করে? আসরে দু-চারজন তবলচি যে না ছিল, তা নয়, তবে তারা বিলু খাঁর সঙ্গে বাজানোর সাহস রাখে না। একজনকে ধরেবেঁধে তবলায় বসানো হল বটে, কিন্তু বাঘা ওস্তাদ বিলু খায়ের ভয়ে তাঁর দাঁতে-দাঁতে এমন খটখটি হতে লাগল যে, বাধ্য হয়ে তাকে তুলে দিতে হল। এদিকে তবলচির অভাবে আসর পণ্ড হওয়ার জোগাড়। জমিদার রাঘব রায়চৌধুরী তখন শশীদাদুকে ডেকে বললেন, "আপনি না বাঁচালে আর উপায় নেই। আমার লজ্জায় মাথাকাটা যাবে।"

শশীদাদু বললেন, "তবলা বাজাতে তো দুটো হাত লাগে, আমার তো মোটে একটা হাত দেখা যাক চেষ্টা করে। "

তা হাত তো চলে এল। কিন্তু হাত দেখে ওস্তাদজি এমন হাঁ হয়ে গেলেন যে, আধঘণ্টা তাঁর গলা দিয়ে শব্দই বেরোল না।

পরে তাঁকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শরবত পান ইত্যাদি খাইয়ে একটু সুস্থ করে তোলা হল। গানও তিনি ধরলেন বটে, কিন্তু সুর লাগাতে পারছিলেন না। কিন্তু যখন তবলায় বোল ফুটতে শুরু করল তখন ওস্তাদজীর গানেও সুর লেগে গেল ! একখানা হাত যে একই সঙ্গে ঝড়ের গতিতে তবলা আর ডুগিতে যাতায়াত করে এরকম দুরূহ বোল তুলতে পারে, তা চোখে না দেখলে এবং কানে না শুনলে বিশ্বাস হওয়ার কথাই নয়। গানের শেষে ওস্তাদজী খুশি হয়ে বললেন, "বহু তবলচি দেখেছি, কিন্তু এরকম সঙ্গত আর পাইনি।"

ভৈরবী নদীতে সেবার বর্ষাকালে নৌকোডুবিতে অন্তত ষাট-সত্তরজন তলিয়ে গিয়েছিল। সেই ভীষণ স্রোতে কারও বাঁচার আশা ছিল না। শশীদাদুর হাত টপটপ

জলে ডুবে এক-একজন ডুবন্ত মানুষকে চুলের মুঠি ধরে তুলে এনে তীরে ফেলতে লাগল। একটা মানুষকেও মরতে দেয়নি।

তবে হাতের সবচেয়ে বড় অবদান হল কুঞ্জপুকুরের পুব দিকে শ্মশানঘাটের কাছে পঞ্চবটীর কুখ্যাত ডাকাত সর্দার ভীম দাসকে ঢিট করা। ভীম দাস ছিল এলাকার ত্রাস। ডাকাতি করার জন্য তার রাতের অন্ধকার দরকার হত না। দিনমানেই গিয়ে যে-কোনও বাড়িতে লুটপাট করে আসত। দারোগা-পুলিশও তাকে যমের মতো ভয় খেত।

সারা পৃথিবী ঘুরে যেবার শশীদাদু গাঁয়ে ফিরলেন, সেবারকার ঘটনা। গাঁয়ের পরেশ পাল গরিব মানুষ। মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। পরেশবাবু অতি কষ্টে ধার-দেনা করে মেয়ের জন্য গয়না গড়িয়েছেন। সেই গয়নায় সাজিয়ে মেয়েকে বিয়ের আসরে নিয়ে এসেছেন। এমন সময়ে ভীম দাস দলবল নিয়ে রে-রে করে হাজির। ডাকাতদের হাতে সড়কি, বল্লম, টাঙি, খাঁড়া, বন্দুক দেখে নিমন্ত্রিতরা পালিয়ে গেল। বরযাত্রীরা গিয়ে ঝাঁপ খেল পুকুরে। বরকর্তা সুপুরিগাছে উঠে পড়লেন। বরও পালানোর চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু গাঁটছড়া বাঁধা থাকায় পারেনি। ভীম দাস কনের গা থেকে গয়না খুলে নিল, বরকে দিয়ে পা টেপাল, তারপর দলবল নিয়ে নেমন্তন্নবাড়ির সব আনন্দ মাটি করে দিয়ে রওনা দিল। ঠিক সেই সময়ে শশী গাঙ্গুলি এসে তার পথ আটকে দাঁড়ালেন। বললেন, "কেমনধারা লোক মশাই আপনি? একটা মেয়ের বিয়ে পণ্ড করে দিলেন? এমন একটা শুভ কাজে বিঘ্ন ঘটানো কি মানুষের কাজ?"

লোকটার স্পর্ধা দেখে ভীম দাস এমন অবাক হল, কিছুক্ষণ বাক্য বেরোল না। তারপর একটা হুঙ্কার দিয়ে সে বলল, "কার সঙ্গে কথা বলছিস, জানিস?"

শশী গাঙ্গুলি একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে বললেন, "জানি। আপনি একটা ছুঁচো, ডাকাতদের মধ্যেও অনেক সহবত জানা ডাকাত আছে, তারা অনেকে দান-ধ্যানও করে। কিন্তু আপনি একটি নোংরা লোক। ভাল চান তো গয়নাগাটি, বাসনকোসন সব ফিরিয়ে দিন। নইলে ভাল হবে না।"

এই কথা শুনে ভীম দাসের সে কী অট্টহাসি! হাসির দমকে ঝাড়বাতি অবধি দুলতে লাগল, কুকুরেরা কেঁউ-কেঁউ করতে করতে পাড়া ছেড়ে পালাল।

হাসি থামার পর ভীম দাস মোলায়েম গলায় বললে, "ফিরিয়ে না দিলে কী করবি? মারবি নাকি রে? অ্যাঁ। মারবি? তা মারবি যে, হাতে তো একটা লাঠিও নেই দেখছি। আর ওই রোগাপটকা হাত দিয়ে যদি মারিসও, তা হলে যে তোর হাতটাই জখম হবে। আমার এই শরীর এত শক্ত যে, বল্লম অবধি গাঁথতে চায় না। আয় না, কাছে আয়, একটু ধরেই দেখ না আমার হাতখানা, আমার গা টিপে দ্যাখ।"

শশী গাঙ্গুলি ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বললেন,"তোমার মতো পাপীকে ছুঁলে চান করতে হবে। এই শীতের রাতে আমি তা পেরে উঠব না বাপু। যা বলছি ভালয়-ভালয় করো, গয়নাগাটি যার যা নিয়েছ সব ফিরিয়ে দাও, তারপর নাকে

খত দিয়ে বাড়ি যাও। আর ডাকাতি-টাকাতি কোরো না, কথা না শুনলে মুশকিল আছে।”

ভীম দাসের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। হাতের তলোয়ারখানা তুলে তবে রে বলে বনবন করে কয়েক পাক ঘুরিয়ে সে শশী গাঙ্গুলির ওপর লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, লাফ মেরে সে সেই যে শূন্যে উঠল, আর নামল না দেখা গেল ভীম দাস ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে তো উঠেই যাচ্ছে। ভীম দাসের চোখ ছানাবড়া, হাত-পা ছুঁড়ছে আর চেঁচাচ্ছে “ওরে তোরা আমাকে নামা, নামা। এসব কী হচ্ছে! পড়ে যাব যে। আমার ঘাড়টা এমন সাপটে ধরেছে কে বল তো?” ঘাড়ে যে হাতখানা চেপে বসেছে, তাকে ছাড়ানোর অনেক চেষ্টা করল ভীম দাস। পারল না। প্রায় তিনতলা সমান উঁচুতে তুলে তারপর খানিক দূর নিয়ে গিয়ে হাতটা দুম করে ছেড়ে দিল তাকে। আর ভীম দাস তার পর্বতপ্রমাণ শরীরটা নিয়ে গদাম করে পড়ল পুকুরে। ফলে পুকুরে সমুদ্রের মতো ঢেউ উঠল। এই দৃশ্য দেখে ডাকাতরা চোঁ-চাঁ দৌড়তে শুরু করল। কিন্তু পারল না।

দুমদাম ঘুসি খেয়ে সব ছিটকে-ছিটকে পড়তে লাগল। মাত্র কয়েক মিনিটেই কাজ শেষ।

এর পর ঘাবড়ে-যাওয়া ডাকাতরা শশী গাঙ্গুলির হুকুমে বরযাত্রীদের খাওয়ার সময় পেছনে দাঁড়িয়ে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করল, এঁটো পরিষ্কার করল, কুয়ো থেকে জল তুলে আনল স্বয়ং ভীম দাস আর তার পয়লা নম্বর শাগরেদ বটু কীর্তনিয়া বরকর্তা আর কন্যাকর্তার পা টিপল বসে-বসে। শেষমেশ বিয়েবাড়ির নেমন্তন্নও তারা খেল। যাওয়ার সময় ভীম দাস বিনয়ে বিগলিত হয়ে হাত কচলাতে-কচলাতে বলল,“জিনিসটা বড়ই সরেস ওস্তাদজি, আমার দুঘড়া খাটি মোহর আছে, যদি জিনিসটা দেন তো দুঘড়া মোহরই আপনাকে প্রণামী পাঠিয়ে দেবখন। এরকম একখানা জিনিস থাকলে আমার কাজকারবারে বড় সুবিধে হয়। রোজ-রোজ বুটমুট লোকজনের ওপর হামলা-হুজ্জত করতে আমারও আর ভাল লাগছে না। হাতখানা পেলে তাকে দিয়েই সব কাজকারবার করাব, আর আমি বসে বসে টাকা আর মোহর গুনব।”

শশী গাঙ্গুলি একটু হেসে বললেন, “এ তো খুব ভাল প্রস্তাব। আগে নাকে খতটা দাও, তারপর হাতজোড় করে সকলের কাছে কবুল করো যে, আর জীবনে ডাকাতি করবে না, তারপর কথা হবে।”

ভীম দাস নাকে খত দিল, কবুলও করল

"এবার দুঘড়া মোহর নিয়ে এসো। ”

ভীম দাসের শাগরেদরা তক্ষুনি গিয়ে মোহর নিয়ে এল। শশী গাঙ্গুলি খুশি হয়ে বললেন, “দুঘড়া মোহরে অনেক কাজ হবে।

গাঁয়ের রাস্তাঘাট মেরামত, পুকুর সংস্কার, গরিব মেয়েদের বিয়ে, গরিব ছেলেদের লেখাপড়া শেখা, আরও কত কী ! ওহে ভীম দাস, যাও, হাতখানা তুমিই নিয়ে যাও।”

ভীম দাস মহা উল্লাস করতে-করতে ফিরে গেল হাতখানা নিয়ে। দুদিন বাদে এক সকালে হাতখানা নিয়ে শশী গাঙ্গুলির পায়ে এসে আছড়ে পড়ে বলল, "হাত ফেরত নিন ওস্তাদজি, গত দুদিন আমাকে দিনে-রাতে তিষ্টোতে দেয়নি। খেতে বসেছি, অমনই হতচ্ছাড়া এসে এমন কাতুকুতু দিল যে, খাওয়া মাথায় উঠল। ঘুমোতে গেলেই মাথায় এসে তবলা বাজায়। শাগরেদদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছি, কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ এসে গলা টিপে ধরল। গতকাল ডাকাতি করতে বেরোতে যাচ্ছি ব্যাটাকে সঙ্গে নিয়ে, এই দেখুন গালে এমন চিমটি দিয়েছে যে, কালশিটে পড়ে গেছে। এ-বেয়াদব হাত আমার চাই না। আমার দলও ভেঙে যাচ্ছে। বিয়েবাড়ির ঘটনার পর থেকে আমাকে আর কেউ মানছেও না। আমি আমার মামাশ্বশুরের গাঁ মনসাপোঁতায় চলে যাচ্ছি। চাষবাস করেই বাকি জীবন খাব।"

তা শশীদাদুর সঙ্গে-সঙ্গে সেই হাতখানাও ঝিমিয়ে পড়ায় তল্লাটে মহা দুশ্চিন্তা।

দুই

নন্দ কবিরাজ খুবই চিন্তিত, শশী গাঙ্গুলির অবস্থাটা তিনি ভাল বুঝতে পারছেন না। রোগলক্ষণ তেমন কিছু নেই। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতাতেই ঝিমিয়ে পড়ছেন বলে মনে হচ্ছে তাঁর। অনেকরকম পাঁচন করে খাইয়ে ফল পাচ্ছেন না তেমন। একটা পুরনো দুষ্প্রাপ্য বইয়ে গতকালই একটা ভেষজ ওষুধের কথা পেয়েছেন। ত্রিশ রকমের গাছগাছড়া আর মূল লাগবে। সেইসব ভেষজ জোগাড় করা চাট্টিখানি কথা নয়! গাঁয়ে মাতব্বরদের বলেছেনও সে-কথা। তারা বিভিন্ন জায়গায় লোক পাঠাচ্ছেন সেইসব জিনিস সংগ্রহ করতে।

শশী গাঙ্গুলির নাড়ির গতি খুব ক্ষীণ। দুর্বলতা এতই বেশি যে, চোখের পাতা মেলতে পারেন না। ডাকলে সাড়া দেন না। সন্ধেবেলা শশী গাঙ্গুলিকে দেখে নন্দ কবিরাজ খুব অন্যমনস্কভাবে বাড়ি ফিরছিলেন। ভেষজগুলো যদি ঠিকমতো পাওয়া যায় তা হলে ওষুধটা তৈরি করতে দিন সাতেক সময় লাগবে। এই দিন সাতেক রোগীকে বাঁচিয়ে রাখার উপায় চিন্তা করছিলেন তিনি। নানারকম নিদানের চিন্তা মাথায় ঘুরছে ।

ডাইনি পুকুরের কাছে বাবলাগাছের জঙ্গল। জায়গাটা ভারি নির্জন আর অন্ধকার। চারদিকে শুধু জোনাকি পোকা জ্বলছে। বহু পুরনো একটা জামগাছ ডালপালা মেলে আকাশটা একরকম ঢেকেই ফেলেছে। সন্ধের পর এ-রাস্তায় লোক-চলাচল নেই। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন বেশ অমায়িক গলায় বলে উঠল, “কবরেজমশাই নাকি?”

গলাটা অচেনা। নন্দ কবিরাজ ফিরে তাকিয়ে বেঁটেমতো একটা ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেয়ে বললেন, “কে আপনি?”

“আমাকে চিনবেন না। অধমের নাম দিনু বিশ্বেস। শশীবাবুকে দেখে এলেন বুঝি? তা অবস্থা কেমন?”

শতবার এই প্রশ্নের জবাব দিতে-দিতে নন্দ কবিরাজ একটু বিরক্ত, বললেন, “ওই একই রকম। ভালও নয়, খারাপও নয়। ”

“পাল্লাটা কোনদিকে ভারী? ভালর দিকে, না খারাপের দিকে?”

“বলা কঠিন।” বলে কবিরাজমশাই মুখ ফিরিয়ে হাঁটা ধরলেন ।

লোকটি পিছু পিছু আসতে আসতে বলল,“কবিরেজমশাইয়ের কি তাড়া আছে নাকি?”

নন্দ কবিরাজ এবার একটু চটে উঠে বললেন, “তা দিয়ে তোমার কী দরকার হে?”

খুবই অমায়িক গলায় লোকটা বলল, “শুনতে পাচ্ছি, আপনি নাকি নতুন একটা ওষুধের সন্ধান পেয়েছেন। সেটা নাকি মৃতসঞ্জীবনী। এক ঢোক খেলেই মরা মানুষও উঠে বসে! তাই বলছিলুম, কাজটা কি ঠিক হবে কবরেজমশাই?

শশীবাবুর আয়ু প্রকৃতির নিয়মেই ফুরিয়েছে। তাকে জোর করে বাঁচিয়ে রাখলে কি খোদার ওপর খোদকারি হবে না?”

নন্দ কবিরাজ খাপ্পা হয়ে বললেন, “আচ্ছা বেয়াদব লোক তো তুমি? আমাকে নীতিকথা শেখাচ্ছ?”

“আজ্ঞে না। নীতিকথা আপনারও কিছু কম জানা নেই। তবে হয়তো সবসময়ে খেয়াল রাখতে পারেন না। তাই একটু স্মরণ করিয়ে দেওয়া আর কি?”

“স্মরণ আর করাতে হবে না। আমার স্মৃতিশক্তি যথেষ্ট আছে। এবার বাপু, তুমি নিজের কাজে যাও।”

লোকটা খ্যাঁক করে একটু হেসে বলল,“আজ্ঞে, নিজের কাজেই আসা। আপনার হাতে যদি সময় থাকে, তবে দুটো কথা বলতুম।”

“না, আমার সময় নেই। তুমি এসো গিয়ে।”

"শুনতে না চাইলে শুনবেন না, কান দুটো তো আপনার। না শোনার হক তো আছেই। তবে কিনা কথাটা খুব মন্দ ছিল না।”

নন্দ কবিরাজ মনে-মনে চটে গেলেও নিজেকে সংযত করে বললেন, “সংক্ষেপে বলতে পারলে বলে ফেলো। হাঁটতে-হাঁটতেই বলো।”

“আজ্ঞে, তা হবে না। ডাইনি-পুকুরের ওধারে আমার পক্ষে যাওয়ার অসুবিধে আছে। দয়া করে এখানেই একটু দাঁড়িয়ে যান। নিরালা আছে, অন্ধকারও আছে। কথাটা পাঁচকানও হবে না, আর আমার পোড়া মুখখানাও আপনাকে দেখতে হবে না।”

লোকটার কথার ধরন-ধারণ মোটেই ভাল ঠেকল না নন্দ কবিরাজের কাছে। কিন্তু তিনি মাথা গরম করলেন না। বললেন, “এমন কী কথা বাপু যে, নির্জনে বলতে হবে? তুমি কোথা থেকে আসছ? মতলবটাই বা কী?”

“অত কথা খোলসা করে বলতে কিছু অসুবিধে আছে কবরেজমশাই। শনৈঃ শনৈঃ জানতে পারবেন অবশ্য।”

লোকটার মুখে শনৈঃ শনৈঃ শুনে নন্দ কবিরাজ একটু ভ্রূকুটি করলেন। বললেন, “ঠিক আছে। যা বলার আছে, বলো।”

“বলছিলাম কি, শশীবাবুর আয়ু ফুরিয়েছে। শরীরটাও জরাজীর্ণ। আপনি আর দয়া করে তাঁর চিকিৎসা করবেন না। গাছগাছড়া আনতে চারদিকে লোক গেছে শুনলাম। তা সেগুলো তাঁরা আনুন। আপনার আর সেগুলো কাজে লাগিয়ে দরকার নেই।”

“তার মানে?”

“মানে খুব সোজা। শশীবাবুর গঙ্গাযাত্রায় আর বিলম্ব ঘটিয়ে পাপের বোঝা ভারী করবেন কেন?”

“তুমি কি শশীবাবুর মৃত্যু চাও?”

“ছিছি। কী যে বলেন! গীতায় সেই যে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, মনে নেই? যা ঘটার তা ঘটেই আছে, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও সব্যসাচী! এ হল প্রায় সেই বৃত্তান্ত।

শরীরের খাঁচাটা পুরনো হলে তো বদলাতেই হয়, না কি? আপনি এত বড় কবরেজ, জীবন-মৃত্যু নিয়ে কারবার, এ কি আপনার জানা নেই?”

নন্দ কবিরাজ কুপিত এবং বিস্মিত হয়ে বললেন, “তোমার মতলব তো ভাল ঠেকছে না বাপু ! তুমি তো দেখছি, মানুষ খুন করতে পারো?”

লোকটি খুবই শান্ত ও অমায়িক গলায় বলল, “তাই যদি হবে, তা হলে শশীবাবুকে তো কবেই খুন করে ফেলতে পারতাম। নির্জীব হয়ে পড়ে আছেন, ও-মানুষকে খুন করা শক্ত কী?”

“তা হলে চিকিৎসা বন্ধ করতে বলছ কেন?”

লোকটা যেন খুবই সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, “খুনের কথাটা তুলে আপনি বড্ড গণ্ডগোলে ফেলে দিলেন। ওসব কথা ভাবাও পাপ । খুনের কথা হচ্ছে না, বলছি, বয়সের নিয়মে উনি যদি মারাই যান, তা হলে তাতে বাঁধা হওয়া উচিত নয়। একশো সাত বছল বেঁচে আছেন, আর কিসের দরকার বলুন তো?”

“তোমাকে বাপু, পুলিশে দেওয়া উচিত। শশী গাঙ্গুলি মারা গেলে কী হবে জানো? তোমার মতো পাজি লোকেদের আস্তানা হবে এই কুঞ্জপুকুর।”

লোকটা খ্যাঁচ করে একটু হেসে বলল, “চোখ বটে আপনার! এই অন্ধকারেও আমাকে পাজি বলে ঠিক চিনেছেন কিন্তু।”

“তোমার মতো লোককে চিনতে দেরি হয় না। শোনো বাপু, শশী গাঙ্গুলির শত্তুরের অভাব নেই। একটা জীবন বিস্তর চোর-ডাকাত, গুণ্ডা-বদমাশকে টিট করেছেন। তারা যে শশী গাঙ্গুলির মৃত্যু চায়, তাও আমরা জানি। আর তাই শশীখুড়োর বাড়ির চারধারে গাঁয়ের লোক শক্ত পাহারা বসিয়েছে। গাঁয়েও দল বেঁধে টহল দিচ্ছে। কাজেই তোমাকে বলি, সরে পড়ো। সুবিধে হবে না।”

লোকটা একটুও চটল না। পরম বিনয়ের সঙ্গে বলল, “যে আজ্ঞে! আমি হেরেই গিয়েছি বলে ধরে নিন। তবে কিনা, আর একটা ছোট মাপের কথা ছিল। সেইটে বলেই আমি নাহয় সরে পড়ব। অভয় দেন তো বলি?”

“তোমার আস্পর্দা দেখে অবাক হচ্ছি। তবু বলেই ফেলো।”

“আপনার একটা ফুটফুটে নাতি আছে। তার নাম বাবলু। বছর পাঁচেক বয়স হবে। ঠিক বলছি?”

নন্দ কবিরাজ একটু শক্ত হয়ে গেলেন । বললেন, “হ্যাঁ, কিন্তু কী চাও?”

লোকটি খুবই দুঃখের গলায় বলল, “বেলতলার মাঠে আজ বিকেলেও খেলছিল অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে, কিন্তু সন্ধের পরও সে আজ বাড়ি ফেরেনি।”

“অ্যাঁ !" বলে নন্দ কবিরাজ চমকে উঠলেন।

লোকটা শশব্যস্তে বলল, “আহা, ব্যস্ত হবেন না। তাকে খুঁজতে চারদিকে লোক গেছে। এই পথেই একটু আগে খুঁজে গেছে তারা। বাড়ির আর আশপাশের পুকুরে জাল ফেলা হচ্ছে। একটু এগোলেই শোরগোল শুনতে পাবেন।”

“সর্বনাশ!" বলে নন্দ কবিরাজ ঘুরে দু পা এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লেন।

লোকটা পেছন থেকে বলল, "বলেছি তো ব্যস্ত হবেন না ! ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। বাবলুকে পুকুরে বা আর কোথাও পাওয়া যাবে না।"

নন্দ কবিরাজ কাঁপতে-কাঁপতে হাতের মোটা বাঁশের লাঠিটা তুলতে যাচ্ছিলেন। লোকটা একটু পিছিয়ে গিয়ে বলল, "কাজটা কাঁচা হয়ে যাচ্ছে না কবরেজমশাই?"

"তুই ! তুই আমার নাতিকে চুরি করেছিস?"

"চুরি! চুরির কথা উঠছে কিসে? ধরে নিন না কেন, তাকে একরকম পুষ্যিই নিয়েছি। ঘাবড়াবেন না, সে এখন আমাদের ডেরায় দিব্যি ভাত খাচ্ছে। তারপর ঘুমোবে। খেলনা-টেলনাও দেওয়া হয়েছে। নাতি কিছু খারাপ নেই।"

"কী চাস?"

"এইবার বিবেচকের মতো কথা বলেছেন। পাকা মাথা দিব্যি কাজ করছে। খামোক লাঠি চালিয়ে একটা কেলেঙ্কারি করতে যাচ্ছিলেন। বুদ্ধিমান মানুষ সব সময়েই পরিস্থিতি বুঝে সেইমতো চলে। লাঠিখানা দিয়ে আমার মাথা যদি ভাঙতেন, তা হলে আমার তুচ্ছ প্রাণটাই তো শুধু যেত না, আপনার আদরের নাতিটারও আর হদিস পেতেন না।"

নন্দ কবিরাজ বাঘা গলায় গর্জন করে বললেন, "বাজে কথা ছাড়ো। কাজের কথায় এসো।"

"তুই-তোকারি করছিলেন, তা সেটাও চালিয়ে যেতে পারেন। বড়ই তুচ্ছ মানুষ আমরা। না, না, আর বেশি রেগে যাবেন না। আপনার বয়স পঁচাত্তর, এই বয়সে রাগটাগ ভাল নয়। অভয় দিলে এবার তা হলে কাজের কথায় আসি?"

নন্দ কবিরাজ রাগ-দুঃখ-ভয়ে কথা বলতে পারলেন না। লোকটা খুবই বিনম্র গলায় বলল, "কাজের কথাটা খুবই সরল। যাকে বলে, ফেলো কড়ি মাখো তেল। কিংবা শঠে শাঠ্যং। কিংবা, কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ ! না, না, এই শেষেরটা ঠিক লাগসই হল না।"

নন্দ কবিরাজ ফের গর্জন করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কাহিল গলা দিয়ে একটা ফ্যাসফ্যাসে স্বর বেরোল, "কাজের কথাটা বলবে?"

"যে আজ্ঞে, কথাটা বলব বলেই তো ঘাপটি মেরে ছিলুম এতক্ষণ। সাপখোপের ভয়ে আধমরা হয়ে। তা ইদিকে কি শীতে সাপ বেরোয় কবরেজমশাই!"

"বেরোলে তো ভালই ছিল হে ! কেন যে বেরোয় না, কে জানে?"

"যে আজ্ঞে। যথার্থই বলেছেন। প্রকৃতির নিয়ম বলে কথা ! তারা বেরোলে পাপী-তাপীদের গতি কী হত বলুন! কবরেজমশাই, আপনার কি মনে হয় না, এ-জগতে পাপী-তাপীদের কিছু প্রয়োজন আছে? তাই যদি না থাকবে, তা হলে কি ভগবান পাপী-তাপী সৃষ্টি করতেন? বলুন না, আপনি বিজ্ঞ লোক। ক'দিন ধরে খুব ভাবছি, পাপী-তাপীদের বিনাশটা ভগবানও যেন ভাল চোখে দেখেন না, নইলে এতকাল ধরে তারা টিকে থাকত না। শশীবাবুর ওই বিটকেল হাতটার কথাই ধরুন

! কত গুণ্ডা-বদমাশকে মেরে পাট-পাট করল, কত পাপী-তাপীর বারোটা বাজাল, তবু নিকেশ করতে পারল কি? পাপী-তাপী তো নিকেশ হলই না, উপরন্তু নিজেই এখন নেতিয়ে পড়ে আছে।"

"অত ভরসা কোরো না হে। হাতটা আবার একদিন তেড়ে-ফুড়ে উঠবে।"

লোকটি অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল, "উঠবে বলছেন? তা হলে তো ভয়ের কথাই হল মশাই। হেঃ হেঃ, তা যেমন বুনো ওল আছে, তেমনই বাঘা তেঁতুলও আছে। ভগবান সব বন্দোবস্তই করে রেখেছেন কি না। এক তরফ কিছু হতে দেন না। সবসময়ে হাতে দাঁড়িপাল্লা ধরা আছে। পাপ বাড়লে পুণ্যও বাড়িয়ে দিচ্ছেন। পুণ্য কমলে পাপও কমাচ্ছেন। কোনওদিকে পাল্লা বেশি ঝুঁকতে দেন না। ভদ্রলোক আর যাই বলুন, একচোখো নন।"

"আর সময় নষ্ট কোরো না হে। যা বলার, বলে ফেলো।"

"যে আজ্ঞে ! ঘুরেফিরে বলছি। আপনার মতো জ্ঞানী লোকের দেখা তো আমাদের বরাতে সহজে জোটে না। দু দণ্ড দাঁড়িয়ে এই যে কথা বলছি, এতেও আমার কত শিক্ষা হয়ে যাচ্ছে।"

"তোমার হচ্ছে কিনা জানি না, তবে আমার হচ্ছে।"

লোকটি লজ্জার সঙ্গে বলল, "কী যে বলেন কবরেজমশাই ! তবে কিনা হক কথাই বলেছেন। আমিও ভাবি, পাপী-তাপী বা পাজি-দুষ্টুদের কাছে পণ্ডিতদেরও কি কিছু শেখার নেই? ঢের আছে মশাই, ঢের আছে।"

"দিনু বিশ্বেস, কথাটা কী?"

"আজ্ঞে ছোট্ট কথা। বললেই ফুরিয়ে যাবে। শুনলে আপনি হয়তো ভাববেন, এই সামান্য কথাটা দিনু ফস করে বলে ফেলতে পারল না? তবে মশাই, সব কথা ফস করে বলাটা ভালও নয়। জমি তৈরি না হলে কি তাতে বীজ ফেলা ভাল? আপনার বয়স, ব্লাড প্রেশার, হার্টের অবস্থা সব খেয়াল রেখে হুঁশিয়ার হয়ে বলতে হবে তো? কথাটা শুনেই আপনি হয়তো ভিরমি খেলেন, তখন তো আমার একগাল মাছি।"

"তা বটে। তুমি সত্যিই বিবেচক লোক।"

"যে আজ্ঞে! মুখ বটি, তবে অবিবেচক নই। ধরুন, আমি একজন দোকানদার, আমার চাই পয়সা, আর আপনার চাই জিনিস। ঠিক তো?"

"ঠিক।"

"এও সেই বৃত্তান্ত। আপনার চাই নাতি, আর আমাদের চাই হাতি।"

"হাতি?"

"ওই হল। মিল দেওয়ার জন্য বলেছি। আপনার চাই নাতি আর আমাদের চাই হাতটি। বুঝলেন?"

"না।"

লোকটি বিস্মিত হয়ে বলে, "এমন পাকা মাথায় কথাটা ঢেউ খেলছে না কেন, বলুন তো! এ তো জলবৎ তরলং ব্যাপার। শশীবাবুর ওই অলক্ষুনে হাতটি

আমাদের হস্তগত করে দিলেই আমাদের হাত থেকে আপনার নাত ছাড়া পেয়ে যাবে।”

“নাত?”

“ওই হল । মিল দেওয়ার জন্য বলা। আপনার নাতি। ”

নন্দ কবরেজ একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, “এবার বুঝেছি।”

“হেঃ হেঃ। জলের মতো সোজা। তবু বলি, তাড়াহুড়ো করে বোঝবার দরকার নেই। বরং একটু তলিয়েই বুঝুন। অনেক সময়ে বুঝটা তেমন পাকা হয় না। তখনই নানা ফ্যাকড়া বেরোয়। দরকার হলে আরও ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।”

নন্দ কবরেজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “বোঝাও বাপু।”

“শশীবাবুর বাড়ি যেভাবে পাহারা দেওয়া হচ্ছে, তাতে ওই হাতের নাগাল পাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই বলছিলুম, আপনি তাঁর চিকিৎসা করছেন, অবারিত দ্বার, এই ছোট কাজটা যদি নাতির স্বার্থে করে দেন, তা হলে বড় উপকার হয় আমাদের।”

“হাতটা চুরি করতে বলছ?”

“চুরি! ছি ছি, চুরির কথা ওঠে কেন? হস্তান্তর বলে একটা যেন ভাল কথা আছে। বেশ ভদ্র, সভ্য কথা। আপনি যদি হাতটাকে হস্তান্তর করে দেন, তা হলে সব দিক বজায় থাকে।”

লাঠিটা ফের শক্ত করে চেপে ধরলেন নন্দবাবু। ইচ্ছে হল, লোকটাকে আচ্ছাসে ঘা-কতক দেন। কিন্তু তাতে লাভ তো হবেই না, উপরন্তু বাবলুর ক্ষতি হয়ে যাবে। তিনি অসহায় গলায় বললেন, “এ-কাজ আমার দ্বারা হওয়ার নয় বাপু! আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না।”

“ওইসব শব্দ যে কোন আহাম্মক তৈরি করেছিল! বিশ্বাসঘাতকতা কথাটাকে ডিকশনারি থেকে লোপাট করে দেওয়া উচিত। আমি বলি কি কবরেজমশাই, আজ রাতটা বেশ ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন। আমাদের তাড়া নেই। বেশ ভাল করে ভাবুন, যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে। আর ওইসব ভাল-ভাল কথাগুলোকে মোটেই আমল দেবেন না মশাই। আপদ্ধর্ম বলে একটা কথা আছে। বিপদ-আপদ এলে তখন অনেক নীতিবাক্য লঙঘন করাটাই ধর্ম। প্রাণ আগে, না নীতি আগে! যান, এখন বাড়ি যান। ওদিক থেকে লোকজনের সাড়া পাচ্ছি। শুধু একটা কথা মনে রাখবেন, এই যে আমার সঙ্গে আপনার দেখাটি হয়ে গেল, এ-কথা দয়া করে ফাঁস করবেন না। তাতে আপনার নাতির ভাল হবে না। দেখাটা যে হয়েছিল, সেটা একদম বেমালুম ভুলে যান। আমি কাল আবার সন্ধের পর আসব।”

“কোথায় দেখা হবে?”

“সে নিয়ে আপনি ভাববেন না। সুবিধেমতো একটা জায়গায় ঠিক হাজির হয়ে যাবো। যখন একাবোকা থাকবেন, তখন দেখবেন অধম আপনার শ্রীচরণ দর্শনে হাজির।”

বলেই লোকটা অন্ধকারে ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেল।

চিন্তিত কবিরাজমশাই নিজের বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন। মনটা বড়ই বিষন্ন। নানা আশঙ্কায় বুকটা দুরুদুরু করছে। বাবলুকে তিনি প্রাণাধিক ভালবাসেন। বাবলুও সারাদিন দাদুর ছায়া হয়ে ঘোরে। তাকে কোথায় নিয়ে গেল, কী অবস্থায় রেখেছে, মারধর করছে কিনা কে জানে! বেঁচে আছে তো! ভাবতে-ভাবতে নন্দ কবিরাজের দু চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল।

বাড়ির কাছাকাছি হতেই তিনি চারদিকে লোকের ছোটাছুটি আর ব্যস্ততা লক্ষ করলেন। পুকুরের পাড়ে মেলা লোক, হ্যাজাক জ্বলছে। পুকুরে জাল ফেলা হচ্ছে। কে একজন দৌড়ে এসে বলল, "কবরেজমশাই, বাবলুকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

নন্দ কবিরাজ বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। উত্তেজিত হলে চলবে না। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। রাত্রিবেলা বাড়ির লোক ডাকাডাকি করতে এলে তিনি বলে দিলেন যে, তাঁর শরীর-মন কোনওটাই ভাল নেই। কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে।

সারারাত কখনও বসে, কখনও পায়চারি করতে-করতে অনেক ভাবলেন নন্দ কবিরাজ। দিনু বিশ্বেস তাঁকে খুবই ফাঁদে ফেলে দিয়েছে। একটি নিষ্পাপ শিশুর প্রাণরক্ষার জন্য তাঁকে হয়তো নীতিবোধ বিসর্জন দিতেই হবে। সারারাত ধরে তিনি বাড়ির মেয়েদের কান্নাকাটি, চেঁচামেচি শুনতে পেলেন। গাঁয়ের লোকরাও অনেকেই ঘুমোয়নি। বাবলুকে চারদিকে খোঁজা হচ্ছে। থানাতেও খবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে যে বিশেষ লাভ হবে না, তা তাঁর চেয়ে ভাল আর কে জানে!

দারোগা সদাশিব রায় সকালেই এসে হাজির হলেন একটা জিপগাড়িতে চড়ে। মোটাসোটা আহ্লাদে মানুষ। পেটে তাঁর সাতরকমের ব্যামো। কবরেজমশাই বারোমাস তাঁকে ওষুধ গিলিয়ে কিছু করতে পারেননি। করা সম্ভবও নয়। কারণ সদাশিবকে খুশি রাখতে সকলেই তাঁকে প্রতিদিন নানারকম ভেট দিয়ে যায়। পুকুরের মাছ, গরুর দুধ, খাসির ঠ্যাং, ডিম, ক্ষীর, পায়েস, লাউ, কুমড়ো ইত্যাদি থরে-থরে তাঁর বাড়িতে মজুত। সদাশিব খেতে বড় ভালবাসেন। নন্দ কবিরাজ প্রায়ই বলেন, "খাওয়াটা একটু না কমালে যে পাকস্থলী বিশ্রাম পাচ্ছে না সদাশিববাবু। পেটের সহ্যশক্তির তো একটা সীমা আছে।"

সদাশিব অত্যন্ত করুণ মুখ করে বলেন, "তার চেয়ে আমাকে আত্মহত্যা করতে বলুন কবরেজমশাই। তাতে কষ্টটা কম হবে। না-ই যদি খাব, তা হলে বেঁচে থেকে হবেটা কী? আপনি এমন ওষুধ বের করুন, যাতে আমার খাওয়া আর হজম দুটোই বজায় থাকে।"

তা সেটা আর হয়ে ওঠেনি। সদাশিব মোটা মানুষ। শীতকালেও তাঁর ঘাম হয়। সর্বদাই একটা হাঁসফাঁস ভাব। দুঃখ করে বলেন, "কী বলব, এই কুঞ্জপুকুর এলাকায় এসে অবধি চোর-গুণ্ডা-বদমাশদের টিকিরও নাগাল পাচ্ছি না। শশীবাবুর হাতই এখানে হাকিম। বলতে লজ্জা করে, হাতে কাজ না থাকায় আমি থানায় বসে সেপাইদের সঙ্গে লুডো খেলি।"

ভালমন্দ খেয়ে, লুডো খেলে আর আলসেমি করে সদাশিবের এখন করুণ অবস্থা। নড়তে-চড়তে অবধি কষ্ট। বারান্দায় পেতে রাখা চেয়ারে বসে, রুমালে কপালের ঘাম মুছে বললেন, "হাকিম সাহেব শয্যা নেওয়ার পর থেকে চারদিকে যেন বদমাইশির একেবারে হিড়িক পড়ে গিয়েছে।"

কবরেজমশাই অবাক হয়ে বললেন,"হাকিমসাহেব শয্যা নিয়েছেন নাকি? কই, আমি তো খবর পাইনি! এ তো অতি অন্যায় কথা, গত পাঁচ বছর যাবৎ আমি তাঁর চিকিৎসা করে আসছি, আর আমাকেই খবর দেওয়া হয়নি !"

সদাশিববাবু মাথা নেড়ে বললেন, "সে-হাকিম নয়। তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভালই আছেন। আমি আসল হাকিমের কথা বলছি। শশীবাবুর হাত। তিনি সেই যে শয্যা নিলেন, নট নড়ন চড়ন, আর ইদিকে বদমাইশরা কেমন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে দেখুন। যেন ডবল ডোজে ভিটামিন খেয়ে নেমে পড়েছে। চতুর্দিকে চূড়ান্ত অরাজকতা। আর বলবেন না মশাই, এমন তাদের আস্পর্দা যে, কাল নিশুত রাতে আমার শোওয়ার ঘরের জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে সে কী হিঃ হিঃ করে হাসি! শুধু হাসি? তারপর আবার গানও গাইল, মোটা দারোগা হবে রোগা।

"যা বলেছেন! ওই যে ভীম দাস বলে ডাকাতটা ছিল, সে তো ডাকাতি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে গিয়ে দিব্যি চাষবাস করে গেরস্ত হয়ে গিয়েছিল। শুনছি, হাকিমসাহেব শয্যা নেওয়ার খবর পেয়ে সেও নাকি চাষবাস ছেড়ে মোটা দাঁও মারতে এদিকে এসে পড়েছে। হস্তশিল্পী গৌরহরি চুরি ছেড়ে শহরে গিয়ে পানের দোকান দিয়েছিল। সে নাকি পানের দোকান বেচে চলে এসেছে। খুনি জটেশ্বর পয়সা নিয়ে মানুষ খুন করে বেড়াত। হাকিমসাহেবের জন্য দেশছাড়া হয়েছিল। সেও ফের চারপাশে ঘুরঘুর করছে শুনতে পাই। নীলমণি ঘোষের সঙ্গে রামকমল পালের মামলা চলছে। তা জটা নাকি নীলমণিকে বলেছে, মামলা মোকদ্দমা করে বুড়িয়ে যাবেন কেন, পাঁচটি হাচার টাকা ফেলুন, রামকমলের লাশ নামিয়ে দিচ্ছি।"

"ও বাবা!"

"চারদিকে একেবারে পাপের তুফান উঠেছে মশাই। এসব সামাল দেওয়া কি একজন মাত্র দারোগার কাজ! চার-পাঁচজন দারোগা দরকার। আমি দুবেলা মা-কালীকে ডাকছি, শশীবাবু ভাল হয়ে উঠুন, হাকিমসাহেব গা-ঝাড়া দিয়ে কাজে নেমে পড়ুন, আমি জোড়া পাঠা দেব।"

নন্দ কবিরাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, "ঠিকই বলেছেন। চিরকাল দেখে আসছি, কুঞ্জপুকুর আর আশপাশের এলাকা হল গুণ্ডা-বদমাশ তৈরির বীজতলা। এখান থেকেই যত চোর, ডাকাত আর খুনে তৈরি হয়। এখানকার আবহাওয়ায় বোধ হয় কিছু একটা আছে। শশীবাবুর হাত এসে সেই ভিমরুলের চাকে নাড়া দিয়েছিল। গুণ্ডা-বদমাশরা প্রথমটায় গা-ঢাকা দিয়েছিল বটে, কিন্তু এখন সব জো পেয়ে প্রতিহিংসা নিতে দ্বিগুণ উৎসাহে ফিরে আসছে।"

সদাশিববাবু একটু ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে বললেন, "সেইজন্যই তো আমি বদলি চেয়ে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছি। এ-তল্লাটে আমার অনেকদিন হয়ে গেল। আর নয় মশাই। আর আপনারাও বাবলুর জন্য মা-কালীকে ডাকুন। যারা বাবলুকে চুরি করেছে, তারা হয়তো মুক্তিপণ চাইবে। চাইলে সেটা দিয়ে দেওয়াই ভাল। বুঝলেন?"

আর-একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নন্দ কবিরাজ বললেন, "বুঝেছি।"

সদাশিববাবু একটু গলা নামিয়ে বললেন, "শশীবাবুর জন্য যে নতুন ওষুধটা তৈরি করছেন, তার কতদূর?"

নন্দ কবিরাজ একটু বিষন্ন গলায় বললেন, "গাছগাছড়া জোগাড় হচ্ছে।"

"তাড়াতাড়ি করে ফেলুন। গতিক মোটেই সুবিধের নয় কিন্তু।"

গতিক যে সুবিধের নয়, তা নন্দ কবিরাজের চেয়ে ভাল আর কে জানে! দারোগাবাবু বিদায় হলে নন্দ কবিরাজ শশীবাবুকে দেখতে গেলেন। আজ ঘরে ঢুকে তাঁর চোখ প্রথমেই গিয়ে পড়ল হাতটার ওপর। শশীবাবুর খাটের পাশেই টেবিলের ওপর হাতটা রাখা। শশীবাবুর মতোই নির্জীব। শশীবাবুকে পরীক্ষা করার পর নন্দবাবু আজ সাহস করে হাতটা তুলে একটু দেখলেন। একটু নাড়াচাড়াও করলেন।

ক্ষান্তমণি বলল, "বাবার একটা মন্ত্র আছে। সেটা না বললে হাতটা কাজ করে না।"

নন্দ কবিরাজ কথাটা শুনতে পেলেন না। হাতটার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। এই হাতটার ওপর তাঁর নাতির প্রাণ নির্ভর করছে। কী করবেন তা বুঝতে পারলেন না। মনটা বড় ভার হয়ে আছে। এই হাতটা তাঁকে চুরি করতে হবে। তারপর বদমাশদের হাতে তুলে দিতে হবে। ভাবতেও গা শিউরে ওঠে ঘেন্নায়। কিন্তু বাবলুর জন্য এ-কাজ না করেই বা উপায় কী?

তিন

বক্তৃতার শেষদিকে ভীম দাসের গলা আবেগে কাঁপতে লাগল। সে বলল, “ভাইসব, এই কুঞ্জপুকুর, হরিহরপুর, বেলডাঙা, চরণডাঙা, সোনাডিহি, নায়েবগঞ্জ ইত্যাদি জায়গায় বরাবরই বাংলার সুসন্তানরা জন্মগ্রহণ করেছেন। মনে রাখবেন এখানে কালু সর্দারের মতো প্রাতঃস্মরণীয় ডাকাত, গোপাল গায়েনের মতো চিরস্মরণীয় চোর, কৈলাস দাসের মতো দেশবরেণ্য জাল নোট তৈরির কারিগর, দিনে ওস্তাদের মতো শ্রদ্ধেয় ছিনতাইশিল্পী এবং খুনে নবার মতো ডাকাবুকে খুনি কাজকারবার করেছেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এখানে নব-নব প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে। তাঁরা আজ নেই বটে, কিন্তু রেখে গেছেন তাঁদের ঐতিহ্য। তবে আমরা সেই ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারিনি। বাংলার ভাগ্যাকাশে হঠাৎ দেখা দিয়েছিল দুর্যোগের ঘনঘটা। শশীবাবুর ভুতুড়ে হাত আমাদের সঙ্গে শত্রুতা শুরু করায় এই অঞ্চলের গৌরব-রবি অস্তমিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আর ভয় নেই ভাইসব, ওই দ্যাখো প্রভাত-উদয়। চিরকাল তো অন্যায় আর অবিচার টিকে থাকতে পারে না। আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান! শশীবাবু মৃত্যুশয্যায়। তাঁর ভূতুড়ে হাতও আজ নিস্পন্দ। এবার দিনবদলের পালা। আমাদের এখন দলাদলি, ব্যক্তিগত আক্রোশ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে কর্মযজ্ঞে, ঐতিহ্যকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত। কথাটার মানে আপনারা সবাই জানেন। এর মানে হল, ওঠে, জাগো, নিজের পাওনা-গণ্ডা আদায় করে নাও।”

সবাই চটপট হাততালি দিল । কেউ-কেউ ‘কেয়াবাৎ’ বলে তারিফ করল। মিটিংটা বসেছে কালু সর্দারের শ্মশানকালী মন্দিরের চত্বরে, বটগাছের তলায়। সন্ধেবেলা, চারদিকে মশাল জ্বলছে। জনাপঞ্চাশেক কালো-কালো চেহারার চোর-গুণ্ডা-বদমাশ-ডাকাত জড়ো হয়েছে। মিটিং থেকে একটু তফাতে একটা ঝোপের আড়ালে একজন বেঁটে আর একজন লম্বা লোক অলসভাবে বসে আছে। বেঁটে লোকটা বলল, “ফুঃ, এ লোকটার ঘটে বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। বুঝলি ঝিকু, একে মন্ত্রী করা যাবে না।”

ঝিকু বলল, “তোমার তো কাউকেই পছন্দ হচ্ছে না দিনুদাদা। জটেশ্বর অত ভাল বক্তৃতা দিল, তাকেও মনে ধরল না। গৌরহরি কেমন বিচক্ষণের মতো কথাবার্তা কইল, তাকেও বাতিল করে দিলে। তা হলে মন্ত্রীটা করবে কাকে?”

দিনু বলল, “এরা সব চুনোপুটি, বুঝলি? এদের কারও সত্যিকারের উচ্চাকাঙক্ষা নেই। উঁচু নজরের লোক না হলে সুবিধে হবে না কিনা।”

কাছাকাছি একটা মুশকো চেহারার লোক বসে ঢুলছিল। হঠাৎ সে তড়াক করে উঠে বলল, “কে হে তুমি, খুব চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে যাচ্ছ তখন থেকে? আমাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মতো বুকের পাটা পেলে কোথায়?”

দিনু হাতজোড় করে বলল, “মাপ করে দাও ভাই। ঠাট্টা করছিলুম।”

“ঠাট্টা! খুব রসিক লোক দেখছি। আলোতে মুখখানা একটু বাড়াও তো বাছাধন, বদনখানা একটু দেখে রাখি। তোমাকে একটু চিনে রাখা দরকার।”

মাটিতে পোতা একটা মশাল তুলে লোকটা ফস করে দিনুর মুখের সামনে ধরে বলল, “মুখখানা যে চেনা-চেনা ঠেকছে বাপ।”

দিনু খুবই বিনয়ের সঙ্গে বলল,“আমি সামান্য মানুষ, পথেঘাটেই দেখে থাকবেন।”

“সামান্য মানুষ ! তবে যে মন্ত্রী খুঁজছিলে? মন্ত্রী কাদের থাকে জানো? রাজাদের। তা তুমি কোথাকার ছদ্মবেশী রাজা, তা বড় জানতে ইচ্ছে করছে।”

দিনু অধোবদন হয়ে বলল, “আর লজ্জা দেবেন না ওস্তাদ। বছরতিনেক আগে পালঘাটে খুব মারধর খেয়েছিলুম পাবলিকের হাতে মাথায় চোট হল, সেই থেকে কেমন খ্যাপাটে মেরে গেলুম। কেবল মনে হত, আমি হরিণগড়ের রাজা। আশ্চর্য কথা, হরিণগড় কোথায় তাও জানি না। যাই হোক, তিনটি বছর পাগলাগারদে থেকে এই হালে ছাড়া পেয়েছি।”

এদিকে যখন এসব কথাবার্তা হচ্ছে তখন মিটিংয়ে একটা স্লোগান উঠল, “শশীবাবুর সাদা হাত ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও। শশীবাবুর নোংরা হাত নিপাত যাক, নিপাত যাক।”

স্লোগানের মাঝখানেই হস্তশিল্পী গৌরহরি উঠে দাঁড়িয়ে অমায়িক মুখে বলল, “ভাইসব, আপনারা হক কথাই বলেছেন। শশীবাবুর অলক্ষুনে হাতটা ধরাধামে থাকলে আমাদের জীবনে শান্তি বলে কিছু থাকবে না। সুতরাং আমরা ঠিক করেছি, হাতটা তুলে এনে আমরা এই শ্মশানকালীর সামনে বলি দেব। তারপর টুকরো-টুকরো করে কেটে আগুনে আহুতি দিয়ে ফেলব। এই পবিত্র কাজে বেশি দেরি করা ঠিক হবে না। কথায় বলে শুভস্য শীঘ্রম। আগামীকাল কুঞ্জপুকুরে ভৈরব অপেরা যাত্রাগানের আসর বসাবে। গাঁয়ের লোক বেড়িয়ে যাবে যাত্রাগান শুনতে। সেই ফাঁকে আপনাদের সহযোগিতায় এই অধম সামান্য হস্তশিল্পী ওই হাত শশীবাবুর বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলবে। কালই এখানে হাত-বলি হবে। আপনাদের সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।”

কথাটা কানে যেতেই দিনু বলল, “সর্বনাশ ! হাত বলি দিলে যে সব ভেস্তে যাব !” বলেই সে উঠতে যাচ্ছিল।

মুশকো লোকটা তাকে একটা থাবড়া মেরে বসিয়ে দিয়ে বলল, “গল্পটা বেশ ফেঁদেছ বাপ। ভেবেছ পাগল সেজে আমার হাত থেকে রেহাই পাবে? অত সহজ নয়। আমার একটা দোষ হল, পুরনো কথা মনে থাকে না। যতক্ষণ তোমার ওই চাঁদবদনটি কোথায় দেখেছি তা মনে না পড়ছে, ততক্ষণ তোমাকে সরে পড়তে দিচ্ছি না। এখন বলে তো কোথায় তোমাকে দেখেছি!”

দিনু অতিশয় নরম গলায় বলল, “পাগলা গারদেই দেখে থাকবেন। সেখানে রোজ কত বড়-বড় মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হত। প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, বোম্বাই

ছবির হিরো।”

মুশকো লোকটা মশালটা দিনুর মুখের আরও কাছাকাছি এনে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, “উহু, অত সোজা পাত্তর তুমি নও।”

দিনু মুখটা সরিয়ে নিয়ে বলল, “মুখটা যে পুড়িয়ে ফেলবেন মশাই। পোড়া মুখ লোককে দেখাব কী করে?”

মুশকো লোকটা একটু হেসে বলল, “কিন্তু তোমাকে যে চিনে ফেলেছি বাছাধন! তুমি একসময়ে শশীবাবুর বাড়ির ভৃত্য ছিলে না? চুরিটুরি করে বদনাম করেছিলে। শশীবাবু তোমাকে ঘাড় ধরে বের করে দেয়। ঠিক কি না?”

দিনু ভারি লজ্জিত হয়ে বলল, “আজ্ঞে, ঠিকই বলেছেন। শশীবাবুর বাড়িতেই প্রথম হাতেখড়ি। তারপর অবশ্য বিদ্যেটা আর বেশিদূর এগোয়নি। আপনাদের কাছে তো শিখতেই আসা। এখানে মেলা গুণিজন আজ আসবেন জেনে চলে এসেছি। ভাল ওস্তাদ পেলে নাড়া বেঁধে ফেলব।”

লোকটা হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে সবাইকে বলল, “ওরে, এখানে এক মস্ত মানুষ এসেছে আজ। এর পানে একটু তাকা। ”

সবাই তার দিকে তাকাতেই দিনু হাতজোড় করে বলল, “আজ্ঞে আমি তুচ্ছ মানুষ। আপনারা ব্যস্ত হবেন না।”

মুশকে লোকটা বলল, “এ শশীবাবুর ভৃত্য ছিল। এতক্ষণ বসে-বসে কাকে মন্ত্রী করবে, কাকে সেনাপতি করবে, এইসব নিয়ে কথা বলছিল। ধরা পড়ে পাগল সাজছে।”

কে একজন বলে উঠল, “ব্যাটা শয়তা ! গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে।”

ভীম দাস বজ্রগম্ভীর গলায় বলল, “নিয়ে আয় তো ধরে। মা বহুকাল মানুষের রক্ত পায়নি। আজ ওটাকে উচ্ছুগ্গু করে নরবলি দিয়ে দিই!”

রে-রে করে গোটাদশেক লোক ধেয়ে এল তার দিকে। দিনু অবশ্য উত্তেজিত হল না। হাসি-হাসি মুখ করে বসে রইল।

ঝিকু বলল, “পালাও দিনুদা।”

দিনু বলল, “দাঁড়া না। কেরদানিটা দেখি একটু।”

অত লোক এসে যখন হামলে পড়ল দিনুর ওপর, তখনই দিনুর এলেম বোঝা গেল। ওই হাত-পা-শরীরের ভিড়ে বেঁটে দিনু যেন তালগোল পাকিয়ে একখানা বলের মতো একটা ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে গেল শুধু। যখন উঠে দাঁড়াল, তখনও হাতচারেক দূরে সবাই মিলে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। একটু হাসল দিনু, তবে আর দাঁড়াল না। একটু জোর পায়ে হাঁটা দিল।

রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ কবরেজমশাইয়ের জানলায় একটু ঠকঠক শব্দ হল। নন্দ কবিরাজ জেগেই ছিলেন। এসে জানলা খুলে দিয়ে বললেন, “আমার নাতি কেমন আছে, সত্যি কথা বলো।”

“আজ্ঞে, আমরা সত্যি কথা বললেও কেউ বিশ্বাস করে না। সেই দুঃখে সত্যি কথা বলা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। তবু আজ আপনাকে একটা সত্যি কথাই বলার

চেষ্টা করছি, আপনিও বিশ্বাস করার চেষ্টা করুন। আপনার নাতি ভালই আছে। খুব ভাল। এমন কি, সে বাড়ি আসতেই চাইছে না।”

“মিথ্যে কথা।”

“ওই দেখুন, যা বলেছিলাম সত্যি কি না। আমরা সত্যি কথা বললেও কোনও লাভ হয় না।”

“হাতটা পেলেই তাকে ফেরত দেবে তো?”

দিনু ভারি বিনয়ের সঙ্গে বলল, “আজ্ঞে, সে তো বটেই। তবে কিনা ওইসঙ্গে শশীবাবুর ব্যাপারটাও মিটিয়ে ফেললে বড্ড ভাল হয়।”

"শশীবাবুর কী ব্যাপার?”

“ওই যে কথায় বলে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। তা, শশীবাবুর শ্বাস যতক্ষণ চলছে ততক্ষণ আমাদের আশা নেই। তাই বলছিলাম তাঁর একটা বিলিব্যবস্থা হয়ে যাক, তারপর নাতি।”

“তা হবে না। হাতটা এনে দিতে পারি, তার বিনিময়ে বাবলুকে অক্ষত শরীরে ফেরত দিতে হবে।”

দিনু মাথা নেড়ে বলল, “আঁজ্ঞে, তা হয় না।”

“কেন হয় না?”

“শশীবাবু যদি বেঁচে ওঠেন, তা হলে আমার বিপদ আছে। হাত যেখানে যার কাছেই থাকুক, শশীবাবুর হুকুম তামিল করবে। তাজেই উনি বেঁচে থাকলে হাত দিয়ে আমাদের লাভ হবে না মশাই।”

“আমার আর-একটা কথাও আজ আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। সেটা হল, হাতটা যদি আমাকে হস্তান্তর নাও করেন, তা হলেও রক্ষা করতে পারবেন না। ওই হাত কালই গুণ্ডা-বদমাশরা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে নষ্ট করে ফেলবে। আমার কাছে পাকা খবর আছে।”

“আমার নাতির পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। তার মা, ঠাকুমা, বাপ, কাকা, পিসি সবাই কান্নাকাটি করছে। তোমার কি মায়াদয়া নেই বাপু?”

“খুব আছে কবরেজমশাই, খুব আছে। তাকে তো আমি পুষ্যি নিয়েই ফেলেছি প্রায়। ছেলেটাও বড় মিষ্টি। ফেরত দিতে আমার কষ্ট হবে।”

নন্দ কবিরাজ একটু ফুঁপিয়ে উঠে বললেন, “তাকে যদি কষ্ট দাও, তা হলে তোমার ভাল হবে না।”

“চিন্তা করবেন না। সে তোফা আছে। কাল সকালেই হাতটা একটু হাত-সাফাই করে নিয়ে আসুন। রাত্রিবেলা আমি এসে নিয়ে যাব। তারপর মাত্র কয়েকটা দিন। শশীবাবু পটল তুললেই নাতি ফেরত পাবেন।”

“ভগবানের নামে দিব্যি করে বলো।”

“ভগবান! তাঁর নামে দিব্যি করে কী হবে? কথা না রাখলেও ভগবানের গায়ে আঁচড়টিও পড়বে না।”

“তবু বলো।”

"যে আজ্ঞে। আপনি বয়স্ক, শ্রদ্ধেয় মানুষ। ভগবানের দিব্যি করেই বলছি, হাতে হাত, শশীকাত, ফেত নাত।"

"তার মানে কী?"

"মানে খুব সোজা। হাতে হাত, মানে শশীবাবুর হাতটি যখন আমার হাতে আসবে। শশী কাত, মানে শশীবাবু যখন মহাপ্রয়াণ করবেন। আর ফেরত নাত, মানে আপনার নাতি তখনই ফেরত আসবে। জলবৎ-তরলং।"

নন্দ কবিরাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কাল রাতে এসো।"

"আপনার মতো বিচক্ষণ লোক দুটি দেখিনি মশাই। যত দেখছি ততই শ্রদ্ধা হচ্ছে। আপনার মতো মানুষের সঙ্গে কাজকারবার করে সুখ আছে। তা ইয়ে, কবরেজমশাই, আমি এই আপনার মতোই একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী খুঁজছি। আপনি যদি রাজি হয়ে যান, তা হলে আর বৃথা খোঁজাখুঁজির হয়রানির মধ্যে যাওয়ার মানে হয় না।"

"মন্ত্রী!" বলে নন্দ কবিরাজ হাঁ হয়ে রইলেন।

বিনয়ী দিনু বলল, "মন্ত্রীদেরই এখন রবরবা। কবরেজি করে আর কী পয়সাই বা হয় আপনার! মন্ত্রীর বেতন ভাল, উপরি আছে, ক্ষমতাও কম নয়। তবে তাড়াহুড়োর কিছু নেই। মাথাটি ঠাণ্ডা রেখে দুদিন ভাবুন। ভেবেই বলবেন।"

দিনু আর দাঁড়াল না। সরে পড়ল। পিছু-পিছু আসতে আসতে ঝিকু বলল, "এঃ, তুমি যে কবরেজমশাইকে মন্ত্রীর অ্যাপয়েন্টমেন্টটা দিয়েই ফেললে দিনুদাদা! তা আমার ব্যবস্থাটা কী হবে?"

"কেন, তুই হবি আমার কোটাল।"

"কোটাল! কোটাল মানে কী?"

"মানে কি আমিই জানি? শুনেছি রাজাদের একটা করে কোটাল থাকে, তাই বললাম। তা কোটালের কাজও খারাপ হওয়ার কথা নয়। বেতন আছে, উপরি আছে, ক্ষমতাও কম নয়।"

"রাজা তা হলে তুমি হচ্ছই?"

"ওরে, রাজা না হয়ে আমার উপায়ও নেই কিনা। আমার কোষ্ঠীতে যে রাজা হওয়ার যোগ আছে। ইচ্ছে না থাকলেও রাজা আমাকে হতেই হচ্ছে। রাজা হওয়ার ঝকমারি কি কম?"

"তুমি যে শশীবাবুর ভৃত্য ছিলে, আর চুরি করেছিলে বলে শশীবাবু যে তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এ-কথাটা কিন্তু আমাকে বলোনি কখনও।"

দিনু একটু হাসল। বলল, "দুঃখের কথা কি মনে রাখতে আছে রে? ওসব ভুলে যাওয়াই ভাল। আমার জীবনটা দুঃখে-দুঃখে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে আছে, বুঝলি? সেই যখন ছোট্ট ছিলুম তখন থেকেই বেঁটে বলে ছেলেরা আমার পেছনে লাগত। যখন-তখন মাথায় চাটি কষাত। কারও সঙ্গে পারতুম না।"

"তারপর?"

“তারপর কত ঝঞ্ঝাট গেছে। শশীবাবুর বাড়িতে চাকরি পেয়ে প্রথম-প্রথম খুব সুখ ছিল। ভারি ভালবাসতেন আমায়। একেবারে নিজের ছেলের মতো।”

“তা হলে তাড়াল কেন?”

“সেইটেই তো ভাবি। দোষও কিছু তেমন করিনি। ক্ষান্তদিদির একটা বালা সরিয়ে রেখেছিলুম, সেই হল অপরাধ।”

“চুরি করেছিলে?”

“ওসব চুরিটুরি কথাগুলো ফস করে মুখে আসে কেন তোর? আমার এখন একটা সামাজিক মান-মর্যাদা হতে যাচ্ছে। ওসব অসভ্য কথা খবরদার উচ্চারণ করবি না। ব্যাপারটা চুরির পর্যায়েও পড়ে না। নিতান্তই ঘরের ছেলে হিসেবে একটা জিনিস এধার থেকে নিয়ে ওধারে রেখেছিলুম। ওই বদমাশ হাতটা না থাকলে ধরাও পড়তুম না।”

“হাতটা যদি বদমাশই হবে, তা হলে সেটার জন্য এমন হন্যে হয়ে পড়েছ কেন?”

দিনু গম্ভীর হয়ে বলে, “তার কারণ আছে। শশীবাবু মস্ত আহাম্মক। তিনি হাতটা হাতে পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি। কেবল সৎ কাজ করতে লাগলেন। সৎ কাজের দাম কী বল! হাতটার মর্যাদাই উনি বুঝতে পারলেন না। আলাদিনের আশ্চর্য পিদিম যা, এও হল তাই। যা করতে বলা হবে, তাই করবে। শশীবাবু যদি হুকুম করতেন, যাও গিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভল্ট থেকে দু কোটি টাকা নিয়ে এসো, তা হলে হাত তাই করত। তাতে পাপও হত না। নিজে তো আর করছেন না, পাপটপ যা হওয়ার তা ওই হাতের ওপরেই অর্শাবে। নরকে যেতে হয় তো হাতই যাবে। কথাটা আমি ঠারেঠোরে শশীবাবুকে বোঝানোর চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু আহাম্মকরা যদি ভাল কথা বুঝতেই পারবে, তা হলে আর তাদের আহাম্মক বলেছে কেন?”

“তুমি কি হাতটা দিয়ে চুরি-ডাকাতি করাবে নাকি?”

“ফের "চুরি কথাটা উচ্চারণ করলি! চুরির ব্যাপারই নয়। তোকে একটা কথা বুঝিয়ে বলছি, মন দিয়ে শোন। দুনিয়াটা ভগবানের, ঠিক তো?”

“তা বটে।”

“এই দুনিয়ায় গরিব-বড়লোক মিলে আমরা যারা আছি, সবাই তো ভগবানেরই সন্তান, না কি?”

“তাই তো মনে হয়।”

"আর দুনিয়ার যত টাকা-পয়সা, ধনদৌলত, এসবও হরেদরে ভগবানেরই। ঠিক কথা বলছি তো! ভুল বললে ধরিস।”

“ঠিকই বলছ।”

“তা হলে দ্যাখ, বাপের পাঁচ ছেলে যেমন বাপের সম্পত্তির সমান হিস্যাদার, আমরাও ঠিক তেমনই ভগবানের সব জিনিসেরই সমান হিস্যাদার। বুঝলি? ভুল বললে শুধরে দিস।”

“কথাটা তো ন্যায্যই মনে হচ্ছে।”

“তা হলেই দ্যাখ, ভগবানের দুনিয়ায় কিছু লোক লুটেপুটে খায়, কিছু লোক আঙুল চোষে, এরকমটা হওয়া কি ভাল?”

“মোটেই নয়।”

“তা হলে আমি যা করতে যাচ্ছি, সেটাই যা খারাপ হবে কেন? যাদের ফালতু টাকা আছে, তাদের কাছ থেকে খানিকটা নিয়ে গরিবকে দিলাম। তাতে বড়লোকটা একটু নামল, গরিবটা একটু উঠল। একটা বেশ সমান-সমান ভাব এসে গেল! তাই না?”

“খুব ঠিক।”

“তুই দেবী চৌধুরানী বা রবিন হুডের নাম শুনেছিস?”

“কস্মিনকালেও না। তারা কারা?”

“নমস্য ডাকাত। তাদের নাম শুনলে আজও কত সাধুপুরুষও মাথা নেওয়ায়। তা, তারা যা করেছে, তার চেয়ে আমি আর খারাপটা কী করব বল! দুনিয়ায় যে ভগবানের সন্তানদের প্রতি অবিচার চলছে, তার একটা বিহিত করতেই আমার জন্ম। আরও একটা কথা শুনে রাখ।”

“কী কথা দিনুদাদা?”

সবাই ছিল আদতে ডাকাত আর লুঠেরা। দলবল আর টাকার জোরে দলবাজ সর্দাররাই রাজাগজা হয়ে বসেছিল। বুঝতে পারছিস তো? না বুঝলে বলিস, আবার বুঝিয়ে দেব।”

“দিব্যি বুঝতে পারছি।”

“তা হলে চোর ডাকাতের সঙ্গে রাজা-মহারাজাদের আর তফাতটা রইল কী, বল! আলেকজাণ্ডার, তৈমুরলঙ, মামুদ, চেঙ্গিস খানের সঙ্গে রঘু ডাকাত বা কালু সর্দারের কোনও ফারাক দেখতে পাস?”

“কাদের কথা বলছ গ! গণ্ডার, লবঙ্গ, ঝিঙে কীসব বলে গেলে, এরা কারা?”

“ঐতিহাসিক লোক। তোর বুঝে কাজ নেই। এখন চুপ করে থাক। আমাকে একটা গুরুতর কথা ভাবতে হচ্ছে।”

“ভাবো দিনুদা। এই আমি চুপ মারলাম।”

দিনুকে সত্যিই ভাবতে হচ্ছে। কারণ, সে যখন শশীবাবুর বাড়িতে কাজ করত, তখন হাতের কেরামতি দেখে সে তাজ্জব হয়ে যায়। হাতখানা কীভাবে ক্রিয়া করে, সেদিকে তার খুব নজর ছিল। কিন্তু শশীকর্তাও সোজা লোক নন। যা করার করতেন খুব চুপিচুপি, ঘরের দরজা এঁটে।

তবে দিনু হাল ছাড়ার পাত্র নয়। দিনের পর দিন সে বন্ধ দরজায় আড়ি পাতত। দরজায় গোপনে একটা ছিদ্রও করে রেখেছিল সে। সেই ছিদ্র দিয়ে দেখারও চেষ্টা করত। অনেক দিনের চেষ্টায় সে বুঝতে পেরেছিল, হাতটাকে শক্তি সঞ্চার করার একটা মন্ত্র আছে। প্রত্যেকদিন সকালবেলায়, ব্রাহ্মমুহূর্তে হাতটাকে জাগিয়ে তুলতে হয়। না তুললে হাতটা কাজ করে না!

কিন্তু মন্ত্রটা কী, তা জানা যাবে কী করে? শশীকতা বন্ধ ঘরের মধ্যে ব্রাহ্মমুহূর্তে কী মন্ত্র পাঠ করেন, তা শোনার তো উপায় নেই। তবে বুদ্ধি থাকলে উপায় হয়। পাড়ার বসন্ত পাল কানে কম শোনেন। তাঁর একটা কানে শোনার যন্ত্র ছিল। স্নানের সময় সেটা খুলে রাখতে হত। দিনু একদিন ফাঁক বুঝে বসন্ত পালের বাড়ি থেকে সেটা সরিয়ে ফেলল। তারপর যন্ত্রটা কানে লাগিয়ে রোজ ব্রহ্মমুহূর্তে গিয়ে দরজায় কান পাতত।

প্রথম কয়েকদিন তেমন সুবিধে হয়নি। তারপর ধীরে-ধীরে যন্ত্রটা কানে সেট করে গেলে একদিন শুনতে পেল, শশীবাবু মন্ত্রটা পড়লেন, "আ মরণ, ফিনাইলের ড্রাম।"

কিন্তু কথাটার তেমন মানে হয় না। 'আ মরণ, ফিনাইলের ড্রাম' কি কোনও মন্ত্র হতে পারে?

আর-একদিন মনে হল, 'আগুন ও পেত্ত্বির ধাম'।

এ-কথাটারও কোনও মানে খুঁজে পেল না সে। তবে রোজ কান পাততে-পাততে একদিন মনে হল, সঠিক মন্ত্রটা হচ্ছে,"আন উনো, ফেরে. ব্যস, বাকিটা আর ধরতে পারেনি। পরদিনই তাকে তাড়ানো হয়। হাতটা হাতানোর ইচ্ছে ছিল। তাও হল না।

কারণ শশীবাবুর কাছ থেকে বিদায় হওয়ার পর সে একটা চুরির কেসে ফেঁসে গিয়ে তিনটি বছর জেলে কয়েদ ছিল।

চার

রাত্রিবলো হরিবল্লভ রায়ের বাড়িতে ডাকাত পড়ল। রাত বারোটা নাগাদ ভীম দাস তার দলবল নিয়ে দরজা ভেঙে যখন বাড়িতে ঢুকল, তখন তাকে দেখে সকলেই থ। গলায় গাঁদা ফুলের মালা, মাথাভর্তি আবির, কপালে সিঁদুরের টিপ। হুহুঙ্কারে চারদিক প্রকম্পিত করে লুটপাট সেরে চলে যাওয়ার সময় হরিবল্লভ রায়কে বলল, "বউনিটা সেরে গেলাম।"

মহিম ঘোষের বাড়িতে ঢুকল চোর, তাঁর বড় ছেলে জানলার শিক ভাঙার শব্দ পেয়ে উঠে টর্চ জ্বেলে দেখতে পেল, জানলায় গৌরহরি দাঁড়িয়ে।

তাকে দেখে জিভ কেটে বলল, "ইস, কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম বুঝি? অনেককালের অনভ্যাস তো, তাই হাতটা সড়গড় নেই। জানলার শিক কাটতে গিয়ে শব্দ করে ফেলেছি। তবে ভাববেন না, কয়েকদিন একটু প্র্যাকটিস করলেই হাত সড়গড় হয়ে যাবে। তখন গেরস্তও নিশ্চিন্তে ঘুমোবে, হস্তশিল্পীরাও নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবে।"

হরিপদ সাহার পাশের বাড়িতেই থাকে তার ভয়রাভাই নবকুমার দাস। দুই ভায়রাভাইয়ে বহুকালের ঝগড়া। হরিপদর জমি নাকি খানিকটা বেদখল করে বসে আছে নবকুমার।

নিশুতরাতে জটেশ্বর গিয়ে হরিপদর জানলায় হানা দিল। বলল, "বউনিতে রেট কম করে দিয়েছি। দুটি হাজার টাকা ফেলুন, আপনার ভায়রার কাটামুণ্ডু আপনার সদর দরজায় রেখে যাব।" শুনে হরিপদ মুর্ছা যায় আর কি!

গাঁয়ে এইসব সাঙ্ঘাতিক-সাঙঘাতিক ঘটনা ঘটায় সকলেই উদ্বিগ্ন। সকালবেলাতেই সবাই শুকনো মুখে শশী গাঙ্গুলির বাড়িতে এসে জড়ো হয়েছেন। ক্ষীণ আশা, যদি শশীবাবু গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠেন, তা হলে এখনও কুঞ্জপুকুরের ভবিষ্যৎ তত অন্ধকার নয়।

নন্দ কবিরাজ সারারাত ঘুমোননি। বসে-বসে ভেবেছেন। বাড়িতে সারারাত বাবলুর জন্য কান্নাকাটি চলেছে। সকালবেলায় মনঃস্থির করে ফেলেছেন তিনি। হাতটা সরিয়েই ফেলবেন। পাপ যা হওয়ার হবে, কিন্তু নাতিটা তো রক্ষা পাবে। আর শশীবাবুর জন্য ওষুধটাও তিনি একটু হাতটান করেই করবেন। দুটো-একটা গাছগাছড়া নাহয় বাদই দেবেন। মনটা অবশ্য সায় দিচ্ছে না, কিন্তু মায়ায় বড় দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

চুরিটুরি জীবনে করেননি। তাঁর হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছিল। "দুর্গা" বলে সকালেই বেরিয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু শশীবাবুর বাড়িতে এসে দেখেন, সাতসকালেই গাঁয়ের মাতব্বররা এসে জুটে গেছেন সেখানে। রাতে যেসব রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে গেছে, তাই নিয়েই তুমুল আলোচনা হচ্ছে। হরিবল্লভ রায়

বলছিলেন, এর একটা বিহিত না করতে পারলে আমাকে সাত পুরুষের ভিটে ছাড়তে হবে।

মহিম ঘোষ বললেন, “আমারও ওই কথা। এই বলে রাখছি, একটা ব্যবস্থা না হলে কুঞ্জপুকুরে আর গেরস্তর বাস থাকবে না।”

সবাই কথা থামিয়ে নন্দ কবিরাজের দিকে উদ্বিগ্ন মুখে তাকাল। হরিবল্লভ বললেন, “ও নন্দ, শশীবাবুকে এবার যদি চাঙ্গা করে তুলতে না পারো, তা হলে সমূহ সর্বনাশ। গুণ্ডা-বদমাশরা যে একেবারে কেত্তন করতে শুরু করল?”

নন্দ কবিরাজ গম্ভীর মুখে বললেন, “দেখছি, কী করা যায়!"

শশীবাবুর ঘরে ঢুকে নন্দ কবিরাজ থ হয়ে গেলেন। শশী গাঙ্গুলির খাটের পাশেই একটা টেবিলে হাতটা রাখা ছিল, এখন সেটা নেই।

ভেতরে-ভেতরে ঘাবড়ে গেলেও মুখটা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে তিনি শশীবাবুর নাড়ি ধরে বসে রইলেন। নাড়ি রোজকার মতোই ক্ষীণ। শশীবাবু সাড়া দিচ্ছেন না।

একটা পাঁচন খাইয়ে দিয়ে নন্দ কবিরাজ ক্ষান্তমণিকে জিজ্ঞেস করলেন, “তা হ্যাঁ গো ক্ষান্তমণি, বলি শশীবাবুর হাতটা কই? সেটা তো দেখছি না? চুরি হয়ে যায়নি তো?”

“না কবরেজমশাই, সেটা আমি লোহার আলমারিতে তুলে রেখেছি। আমাদের কাজের মেয়ে, রাসু কোত্থেকে শুনে এসেছে, আজ নাকি হাতটা চুরি করতে আসবে ভীম দাস আর গৌরহরি। তাই তুলে রেখেছি।”

“তা ভালই করেছ। কোন আলমারিতে রাখলে?”

“ওই তো, বাবার মাথার কাছেই আলমারি।”

“চাবিটা কোথায় রেখেছ?”

“এই তো আমার অঁাচলে’, বলে ক্ষান্তমণি আঁচলে বাঁধা চাবিটা দেখাল।”

নন্দ কবিরাজ হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, “না, না, কাজটা ঠিক হচ্ছে না, চাবি তোমার কাছে রাখলে তোমারই বিপদ। ভীম দাস এলে কি সহজে ছাড়বে? গলায় খাড়া চেপে ধরে চাবি কেড়ে নেবে। তার চেয়ে চাবিটা বরং আর কারও কাছে পাচার করে দাও। বাড়িতে রেখো না।”

“তার দরকার নেই কবরেজমশাই, আজ সবাই আমাদের বাড়ি পাহারা দেবে। সদাশিব দারোগা নিজেও থাকবে।”

নন্দ কবিরাজ একটু হাসলেন, “ওদের তো চেনো না ক্ষান্তমণি, তাই বলছ। গাঁয়ের লোক আর সদাশিব মিলে কিছুই করতে পারবে না। তারা সব বোমা, বন্দুক নিয়ে আসবে। গাঁয়ের ক’টা লোকের ওসব আছে? দিনু দাসের আর হরিবল্লভ রায়ের দু খানা গাদা বন্দুক ছাড়া আর কী আছে বলে ! আর সদাশিব ! ছোঃ। তার যা অবস্থা, তাতে আজকাল ইঁদুরও তাকে ভয় পায় না।”

ক্ষান্তমণি সভয়ে বলল, “ তা হলে কী হবে কবরেজমশাই?”

“হাতটাকে যেমন করেই হোক রক্ষা করতে হবে। চাবিটা অন্য জায়গায় থাকলে ডাকাতরা চট করে নিয়ে যেতে পারবে না। লোহার আলমারি ভাঙতে হবে। কিন্তু এ তো বেশ মজবুত আলমারি দেখছি। ভাঙা সহজ কাজ নয়।

“চাবিটা তা হলে আপনিই নিয়ে যান কবরেজমশাই।”

“না, না, আমি কেন?” বলে নন্দ কবিরাজ একটু আপত্তি প্রকাশ করলেন। তারপর যেন অনিচ্ছের সঙ্গেই বললেন, “আচ্ছা, দাও। কাউকে-না-কাউকে তো দায়িত্ব নিতেই হবে।”

চাবিটা নিতে গিয়ে হাতটা থরথর করে কাঁপছিল তাঁর । গলা শুকিয়ে আসছে। বললেন, “ক্ষান্তমণি, আমার শরীরটা ভাল নেই । নাতির জন্য ভেবে-ভেবে মাথাটাই খারাপ হওয়ার জোগাড় ! আমাকে পাতিলেবুর রস দিয়ে এক গেলাস জল দাঁও তো !”

“এই দিই।” বলে ক্ষান্তমণি প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল। নন্দ কবিরাজ তাড়াতাড়ি উঠে আলমারিটা খুলে ফেললেন। দিনের বেলা, চারদিকে মানুষজন। যে-কেউ দেখে ফেলতে পারে।

হাতটাও বড় কাঁপছে। কিন্তু উপায়ই বা কী? এ-কাজটা না করলে তাঁর নাতির প্রাণরক্ষা হয় না। আলমারির ওপর-তাকে হাতটা রাখা ছিল। চট করে বের করে এনে চাদরের তলায় লুকিয়ে ফেললেন, তিনি। তারপর আলমারিটা বন্ধ করে যেই ফিরেছেন অমনই তাঁর সর্বাঙ্গে যেন একটা বরফের হিমশীতল স্পর্শ খেলে গেল। কেননা তাঁর মনে হল, শশীবাবু যেন এতক্ষণ ঘাড় তুলে তাঁকে দেখছিলেন। তিনি ফিরে তাকানো-মাত্র শশীবাবু যেন মাথাটা বালিশে ফেলে চোখ বুজে ফেললেন।

নন্দ কবিরাজের হাত-পা এত কাঁপতে লাগল যে, তাঁর মনে হল, এবার মূর্ছা যাবেন। হাতটাও তাঁর শিথিল মুঠো থেকে আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দম নিলেন তিনি, যা দেখেছেন তা কি ভুল দেখেছেন? দেখেছেন বলাও ভুল। চোখের কোণ দিয়ে যেন আবছা মনে হল, শশীবাবু তাঁকে দেখছেন। ভুলও হতে পারে। মানুষ যখন আতঙ্কে থাকে, তখন কত ভুলভাল অনুমান করে।

সাহসে ভর করে তিনি আবার শশীবাবুর কাছে এসে বসলেন। নাড়িটা আবার পরীক্ষা করলেন, এখনও নাড়ি ক্ষীণ। তাঁর অভিজ্ঞতা বলে, এই অবস্থায় রোগীর বাহ্যচৈতন্য থাকার কথা নয়। তা হলে ভুলই দেখেছেন।

ক্ষান্তমণি যখন লেবুর জল এনে দিল, তখন বাস্তবিকই তাঁর শরীর খারাপ লাগছে, তেষ্টায় বুকটা কাঠ। ঢকটক করে জলটা খেয়ে নিয়ে উঠে পড়লেন।

বাড়ি ফিরেই নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে—হাতটা আর চাবিটা নিজের লোহার আলমারিতে তুলে রেখে চাবি ট্যাঁকে গুজে ফেললেন। কাজটা বেশ বুদ্ধির সঙ্গেই করেছেন। হাতটা যে চুরি গেছে, তা ক্ষান্তমণি বুঝতেই পারবে না কিছুদিন। চাবি তাঁর কাছে, সুতরাং আলমারি খোলার উপায় নেই।

যারা শশীবাবুর জন্য ওষুধের গাছগাছড়া আনতে গিয়েছিল, তারা সবাই এসে গাছগাছড়া সবই দিয়ে গেছে। নন্দ কবিরাজ সারাদিন ধরে সেইসব গাছগাছড়া সেদ্ধ করতে লাগলেন। কোনওটা রস করলেন হামানদিস্তায়। কোনওটা-বা পুড়িয়ে ভস্ম করতে হল। শক্ত কাজ। তবে দুটো জিনিস ব্যবহার করলেন না। নাতির মুখ চেয়ে এ-কাজ তাঁকে করতেই হবে।

ক্রমে রাত হল। চারদিক নিশুতি হয়ে গেল। এমন সময় জানলায় ঠকঠক শুনে, গিয়ে পাল্লাটা খুললেন।

"কে?"

"অধমের নাম দিনু বিশ্বেস। হস্তান্তরটা হয়ে যাক।"

"দিচ্ছি। কিন্তু আগে বলো, হাতটা নিয়ে তুমি কী করবে?"

দিনু একটু হেসে বলল, "আজ্ঞে, হাত জোগাবে ভাত।"

"তার মানে?"

"গরিব মানুষদের তো ওই একটাই চিন্তা, না কি বলুন। হাতটি পেলে আমার ভাতের জোগাড় হবে।"

"তুমি কি এই হাত কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানো?"

"আজ্ঞে, শিখে নেব।"

"শিখে নেবে? শশীবাবু কাউকে তো বিদ্যেটা শেখাননি।"

"আজ্ঞে না। তবু চেষ্টা করতে দোষ কী?"

"তুমি পাজি লোক। যদি বিদ্যেটা ধরে ফেলো, তা হলে এই হাতকে তো পাপের কাজেই লাগবে।"

"কী বলেন কবরেজমশাই!"

"ভুল বলছি?"

দিনু খুবই লাজুক গলায় বলল,"যতসব চোর-ডাকাতদের দেখেন, তারা হল ভারি নিচু নজরের মানুষ। আমি আজ্ঞে তাদের মতো নই৷ হাতটি কাজে লাগাতে পারলে এই অধম দিনু বিশ্বেস দেখবেন, গাঁয়ের সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে. শশীকর্তা হাতখানা পেয়ে এতকাল চোর-ডাকাত ঠ্যাঙানো আর ম্যাজিক দেখানো ছাড়া আর কী করেছে বলুন তো! মানুষের দুঃখ ঘুচিয়েছে? হাতটাকে ঠিকমতো কাজে লাগালে কত কী করা যেত! একটা পুকুর খোঁড়া যেত, তাতে গাঁয়ের জলকষ্ট দূর হত। টাকা পয়সা রোজগারের কাজে হাতটাকে লাগালে এ-গাঁয়ে আজ একটাও গরিব থাকত না। তারপর ধরুন, এই হাতটাকে লাগিয়ে রাস্তাঘাট তৈরি, হাসপাতাল ব্যবস্থা, কত কী করার ছিল! আমি বলি, শশীকর্তার হাতে পড়েই হাতটার এই দুরবস্থা! এবার উপযুক্ত হাতে পড়ে হাতটা কী খেল দেখায় তাই দেখবেন!"

"তা বাপু, তুমি গতকাল আমাকে মন্ত্রী হওয়ার কথা বলেছিলে। কথাটা একটু খোলসা করে বলবে?"

দিনু খুবই লজ্জিত গলায় বলল, “গরিবের আস্পর্দাটা যদি না ধরেন তো বলি, আমি এই কুঞ্জপুকুর আর তার সঙ্গে দশ-বারোটা গাঁ নিয়ে একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি। একেবারে রামরাজ্য যাকে বলে। কোথাও কোনও অশান্তি-ঝঞ্ঝাট থাকবে না, কোনও অবিচার-অনাচার খুঁজেও পাবেন না। সুখ একেবারে উপচে পড়বে। তা সেই কথা ভেবেই মন্ত্রী হওয়ার কথাটা বলা!”

“তা তুমিই রাজা হবে নাকি?”

একটু আমতা-আমতা করে দিনু বলল, “হওয়ার ইচ্ছে তেমন ছিল না, বুঝলেন। রাজা হওয়ার অনেক ঝকমারি। চারদিক সামলে চলতে গেলে নাওয়া-খাওয়া অবধি ভুলতে হয়। কিন্তু পাঁচজনে ধরে পড়েছে, তাই অনিচ্ছের সঙ্গেই হতে হচ্ছে আজ্ঞে। হস্তান্তরটা কি এইবেলা সেরে ফেলবেন? চারদিকে রাত-পাহারা বসেছে, বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে ভরসা হয় না। কাদের যেন পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি।”

“আগে বলো, আমার নাতি কেমন আছে?”

“আজ্ঞে, ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে। তবু বলি, সে এত ফুর্তিতে আছে যে, বাড়ি ফেরার মোটেই ইচ্ছে নেই। আমারও তাকে বড্ড পছন্দ। আহা, যেন দেবশিশু। আমাকে ‘কাকা’ বলে ডাকছে।”

“সে কি বাড়ির জন্য কান্নাকাটি করছে না?”

“কান্না! কী যে বলেন কবরেজমশাই! আমরা যত তাকে দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি। কান্না তার ত্রিসীমানায় নেই।”

“তুমি কি জানো যে, তুমি অতি পাষণ্ড?”

“লজ্জা দেবেন না কবরেজমশাই। ভাল পাষণ্ড হতে হলেও এলেম চাই, বুকের জোর চাই। আমি বড্ড নরম মনের মানুষ। পাষণ্ড হতে পারলে কষে পায়ের ওপর পা তুলে জীবন কাটাতে পারতুম। তা আর দেরি করাটা কিন্তু ঠিক হবে না। একটু হাত চালিয়ে হাতটা আমার হাতে হস্তান্তর করে ফেলুন হাতটা বেহাত হয়ে গেলে আমাদের আর কিছু করার হাত থাকবে না। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হবে। এই হাত নিয়ে কারও সঙ্গে হাতাহাতি হোক তা আমি মোটেই চাই না।”

কবরেজ শশাই অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে আলমারি খুলে হাতটা বের করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। একটা মস্ত বড় বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে যাচ্ছে। পাপও হচ্ছে। কিন্তু বাবলুকে বাঁচাতে হলে এ ছাড়া আর উপায়ই বা কী? এর পরও আরও পাপ কাজ করতে হবে। শশীবাবুকে সঠিক ওষুধ না দিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া! নন্দ কবিরাজের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। নরকে পচতে হবে। নরক জায়গাটা কতদূর খারাপ, কে জানে!

জানলা দিয়ে হাতটা বাড়াতেই দিনু খপ করে সেটা প্রায় কেড়ে নিয়ে নিল। অমায়িক গলায় বলল, “মন্ত্রী আপনিই হচ্ছেন ধরে নিন। আরও দু-চারজন উমেদার আছে বটে, কিন্তু আপনার দাবিই জোরালো।”

কবরেজমশাই বললেন, "রক্ষে করো বাপু, আমার মন্ত্রী হওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই।”

“আজ্ঞে, আপনি অনেক টা আমারই মতো। কোনও কিছুতেই লোভ নেই। তবে পরের যদি ভাল হয়, দেশের যদি উপকার হয়, তা হলে নাহয় অনিচ্ছের সঙ্গেই হলেন। যেমন আমি। পাঁচজনে ধরে না পড়লে আমিই কি রাজা হতে চেয়েছিলুম ! যাক গে, একটু ভেবে দেখবেন প্রস্তাবটা।”

“তোমার সঙ্গে কথা বললেও পাপ হয়, এখন বিদেয় হও।”

“যে আজ্ঞে আপনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দু দণ্ড কথা বললেও বিস্তর জ্ঞান হয় মশাই। পেন্নাম হই।”

বেঁটে ছায়ামূর্তিটা জানলা থেকে মিলিয়ে যেতেই কবরেজমশাই জানলা বন্ধ করে নিজের চেয়ারখানায় এসে চুপচাপ বসে রইলেন। বুকটা বড় ধুকপুক করছে। সকালবেলায় দৃশ্যটা কি ভুল দেখলেন? শশীখুড়ো যে ঘাড় তুলে মুখ ফিরিয়ে চেয়েছিলেন—সেটা কি একান্তই মনগড়া? মনগড়া হলেও তাঁর কেমন যেন গা-ছমছম করছে। ভয় হচ্ছে। হাতখানা বেহাত হয়ে গেল, সেটাও একটা মস্ত বিশ্বাসঘাতকতা হল। বুড়ো বয়সে এসে এ কী চক্করে পড়ে গেলেন তিনি?

ডাইনি পুকুরের ধারে অন্ধকারে একটা ঝোপের আড়ালে ঝিকু অপেক্ষা করছিল। দিনুকে দেখে বেরিয়ে এসে সঙ্গ ধরে বলল, “পেলে জিনিসটা?”

“দেখ ঝিকু, সব ব্যাপারে নাক গলানোটা আমি পছন্দ করি না। তুই আমার কোটাল, কোটাল থাকবে কোটালের মতো। রাজা-গজার সঙ্গে সমানে-সমানে অত মাখামাখি কিসের!

কটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, “রাগ করো কেন দাদা? যখন রাজা হবে, তখন তো দোবেলা সেলাম ঠুকতেই হবে। এখনও তো হওনি, তাই কদিন একটু মেলামেশা করে নিচ্ছি।”

“ট্রেনিং থাকা ভাল। নইলে বেয়াদবি অভ্যেস হয়ে গেলে তখনও হয়তো ফাজলামি করে বসবি।”

জিভ কেটে ঝিকু বলল, “না, না । সেটা খুব খেয়াল থাকবে।”

দুজনে নীরবে হাঁটল কিছুক্ষণ, তারপর ঝিকু হঠাৎ বলল, “যদি অপরাধ না নাও, তা হলে একটা কথা বলি।”

“কী কথা?”

“বলছিলাম কি, তুমি দরটা বড্ড কম নিলে। অত সস্তায় বাচ্চাটাকে বিক্রি করা তোমার ঠিক হয়নি। মাত্র দুশো টাকা অমন ফুটফুটে ছেলের দাম হয়? হেসেখেলে দু হাজার তো হবেই।”

গম্ভীর হয়ে দিনু বলল, “এইজন্যই তো আমি রাজা, আর তুই কোটাল। সংস্কৃতে একটা কথা আছে জানিস? বিপদে পড়লে পণ্ডিতেরা অর্ধেক ত্যাগ করে। একটা ফুটফুটে বাচ্চা নিয়ে এখন যদি আমি দোরে-দোরে ঘুরে দর বাড়ানোর চেষ্টা করি, তা হলে লোকের সন্দেহ হবে না? আমার তখন ঘাড় থেকে জিনিসটা

নামানোর দরকার ছিল, তাই বেদেদের কাছে বেচে দিলাম। তারা গতকালই এ-তল্লাট ছেড়ে চলে গেছে।”

কুঞ্জপুকুর থেকে মাইলটাক দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা পোড়ো বাড়ি। ধ্বংসস্তুপই বলা যায়। সাপখোপের আস্তানা। ওই ধ্বংসস্তুপের মধ্যেই দুখানা ঘর আজও পড়ো-পড়ো হয়ে কোনওক্রমে টিকে আছে। এখানেই দিনুর আস্তানা। কাছাকাছি লোকবসতি নেই।

ঝিকু বলল,“দেখ দিনুদাদা, তোমার নজরটা কিন্তু তেমন উঁচু নয়। তুমি বলছ, রাজা হলে এই পোড়ো বাড়িটাকেই রাজবাড়ি করবে, এটা আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না।”

“তুই বোকা। এই বাড়িটা এমন সুন্দর করে আবার তৈরি করব যে, দেখে লোকের তাক লেগে যাবে। কিন্তু আজ আর কথা নয়। তুই ঘুমোগে, আজ রাতে আমার জরুরি কাজ আছে।”

ঝিকু পাশের ঘরে ঘুমোতে গেল। কিছুক্ষণ পর যখন তার নাক ডাকতে শুরু করল, তখন দিনু হাতখানা চাদরের তলা থেকে বের করে মোমবাতির আলোয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল ভাল করে। এটা আসল হাতটাই বটে ! সন্দেহের কোনও কারণ নেই।

দিনু শতরঞ্চির ওপর বসে হাতটা মুঠো করে ঘরে ধ্যানস্থ হল, আন উনো এফেন... আন উনো এফেম... আন উনো এফেনড্রাম… না, হচ্ছে না। আন উনো এটেনখাম... নাঃ, ওটাও নয়....

ধৈর্যশীল দিনু সারারাত ধরে চেষ্টা করতে লাগল। শশীবুড়ো অনেকটা এরকমই কী যে বলত, আন উনো... আন উনো এফ এন ডো...আন উনো...

প্রায় ভোরের দিকে দিনু ঢুলতে ঢুলতে হঠাৎ চমকে উঠল। কী হল? হাতটা কি একটু নড়ে উঠল নাকি? নাকি মনের ভুল? ঘুম ছুটে গেল দিনুর। হাতটা চেপে ধরে সে মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। আন উনো এফ এন ডার... আন উনো এফ এন ড্রো...

দিনুকে প্রায় চমকে দিয়ে হঠাৎ তার হাতের মধ্যে হাতটা নেতানো ভাব থেকে চড়াক করে লাফিয়ে উঠল। পাঁচটা আঙুল টান-টান হয়ে উঠল প্রথমে। তারপর আঙুলগুলো বারবার মুঠো হয়ে খুলে যেতে লাগল। জেগেছে ! হাতটা জেগেছে !

দিনু প্রথমটায় হোঃ হোঃ করে খানিকটা হেসে নিল। সারা জীবনের যত স্বাদ-আহ্লাদ সব এবার পূর্ণ হওয়ার মুখে। আর চিন্তা নেই। এখন সে সত্যিই রাজা।

হাতটা শূন্যে উঠে গেল। তারপর ছটফট করতে লাগল। দিনু হাতটার দিকে চেয়ে বলল, “এবার তোর আসল খেল শুরু। শশীকর্তা তোকে কাজেই লাগাতে পারেনি। আহাম্মকের হাতে পড়ে তোর বড্ড হেনস্থাই হচ্ছিল রে। এবার আসল লোকের হাতে এসে পড়েছিস। যা বাবা, প্রথমে একটু হালকা কাজ দিয়েই শুরু কর। হাটগঞ্জের মতি ময়রার দোকানে খুব ভোরবেলা জিলিপি ভাজে, আর হিংয়ের কচুরি। এক চ্যাঙারি জিলিপি আর এক চ্যাঙাড়ি কচুরি নিয়ে আয় তো। ”

হাতটা শোঁ করে বেরিয়ে গেল। তারপর পাঁচ মিনিট যেতে-না-যেতেই পাঁচ আঙুলের ফাঁসে দুটো চ্যাঙাড়ি ঝুলিয়ে ফিরে এল।

"ও ঝিকু, ওঠ, ওঠ। দেখ এসে কাণ্ড! মার দিয়া কেল্লা।"

হাতটা শূন্যে ভাসছিল। দিনু সেটিকে ধরে কম্বলের নিচে চাপা দিয়ে রেখে বলল, "একটু জিরিয়ে নাও বাবা। এর পর মেলা মেহনত আছে।"

ঝিকু ঘুম থেকে উঠে জিলিপি আর কচুরির আয়োজন দেখে অবাক! "এ কী কাণ্ড গো দিনুদাদা?"

"কেল্লা মেরে দিয়েছি। কোটালের চাকরি তোর পাকা। এখন আয়, জিলিপি আর কচুরি খা।"

ঝিকুর চোখ চকচক করতে লাগল। বলল, "সত্যি? তা বেতনটা কত দেবে বলো তো?"

"আহা, আগেই বেতনের কথা তুলিস কেন? আগে কাজকর্ম দেখি, তারপর ঠিক হবে। ধর গে, মাসে দু-তিন হাজার তো হবেই।"

"বটে !"

"তার ওপর উপরি আছে। সেও কম নয়। তার ওপর কোটালের কত বড় সম্মান।"

"কিন্তু কোটাল কাকে বলে তাই তো এখনও জানা হল না!"

"জানা আর শক্ত কী? দুদিন রোস, তারপর সভাপণ্ডিতের কাছে জেনে নিবি।"

"সভাপণ্ডিত! সে আবার কে?"

"রাজাদের ওসব থাকে। তারা তো লেখাপড়া করে না, তাদের হয়ে ওই পণ্ডিতেরা লেখাপড়া করে। রাজার যখন যা জানার, তা ওদের কাছ থেকে জেনে নেয়।"

"এ তো খুব ভাল ব্যবস্থা গো দিনুদাদা।"

দিনের বেলা হাতটাকে বেশি ব্যবহার করাটা যুক্তিযুক্ত মনে হল না দিনুর। পাঁচজনের চোখে পড়ুক এটা সে চায় না। সারাটা দিন সে তাই চুপচাপ রইল। সন্ধের পর ঝিকুকে একটা কাজের ছুতোয় বাইরে পাঠিয়ে সে হাতটাকে বের করে বলল, "শোনো বাপু, আপাতত শক্ত কাজ দিচ্ছি না। আজ বউনির দিন। আমার কাছে খবর আছে, সুলতানগঞ্জের জমিদার নব মল্লিকের পাতালঘরে এক কলসি মোহর আছে। চট করে গিয়ে কলসিটা নিয়ে এসো তো।"

হাতটা চলে গেল। আধঘণ্টা পরে কলসি নিয়ে ফিরে এল। আহ্লাদে দিনুর চোখে জল এসে গেল। মোহরগুলো ঢেলে গুনে দেখল সে। প্রায় দু হাজার মোহর। বিরাট ব্যাপার। তবু এও কিছু নয়। এ তো সবে নেমন্তন্ন বাড়িতে পাতে নুন পড়ার মতো। আসল ভোজ এখনও বিস্তর বাকি।

ঝিকু ফিরে এসে মোহর দেখে মুর্ছা যায় আর কি ! তোতলাতে তোতলাতে বলল, "এই ভাঙা বাড়িতে মোহর? ডাকাত পড়বে যে!"

দিনু বিজ্ঞের হাসি হেসে বলল,“আসুক ডাকাত, আসুক চোর, চিন্তার কিছুই নাই রে মোর। ভয় পাসনে।”

ঝিকুকে ভয় পেতে নিষেধ করলেও, দিনুর মন থেকে একটা ভয়ের ভাব যাচ্ছে না। শশীকর্তা এখনও বেঁচে আছেন। শশীকতার বেঁচে থাকাটাই দুশ্চিন্তার কারণ। পথের কাঁটা। শশীকর্তা যদি তেড়ে ফুড়ে ওঠেন তা হলে কোন কলকাঠি নেড়ে ফের হাতটাকে বশ করে ফেলবেন, তার ঠিক কী?”

খুনখারাপি দিনু করতে চায় না বটে, কিন্তু পথ নিষ্কণ্টক করতে গেলে দু-চারটে লাশ ফেলতেই হয়। উপায় কী? অনেক ভেবেচিন্তে সে মধ্যরাতে সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেলল। হাতটাকে বলল, “বাপু হে, একটু সহজ কাজই দিচ্ছি। আজ রাতেই শশী গাঙ্গুলিকে খুন করে আসতে হবে। কাজ শক্ত নয়, কারণ তাঁর প্রাণটি গলার কাছে এসে আটকে আছে। কষ্টও পাচ্ছেন। তা, তুমি বাপু ওই গলাটিই বেশ শক্ত করে চেপে ধরবে। প্রাণটি বেরিয়ে গেলে তবে ছাড়বে। আর শোনো, শশীকর্তার গলায় কালো সুতোয় বাঁধা একটু ধুকধুক আছে, হাতে আছে বগলামুখী কবচ। তাকে যে খুন করতে পেরেছ তার প্রমাণ হিসেবে ও দুটো নিয়ে এসো।”

হাত চলে গেল ! ঘণ্টাখানেক পরে কবচ আর ধুকধুকি নিয়ে ফিরে এল।

দিনুর মনটা একটু খারাপ হল। একসময়ে শশীকর্তার নুন খেয়েছে। তবে ব্যাপারটা গায়ে মাখল না। এরকম আরও কত জনাকে নিকেশ করতে হবে, কে জানে! রাজা হওয়ার পথে বাগড়া দেওয়ার লোকের কী অভাব?

সকালেই দিনু বাড়িটা মেরামত করার জন্য মিস্তিরি লাগিয়ে দিল। কার বাড়ি, কী বৃত্তান্ত কিছুই জানা নেই। বাড়ি তৈরি হলেই হয়তো ওয়ারিশন এসে হাজির হয়ে বাড়ি দাবি করে বসবে। তবে চিন্তা নেই, দাবি করলে তারও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হাত যখন হাতে আছে, তখন চিন্তা কী?

ঝিকু সকালে কোথায় বেরিয়েছিল, ফিরে এসে খুব উত্তেজিত হয়ে বলল, “ও দিনুদাদা, কুঞ্জপুকুরে খুব কান্নাকাটি পড়ে গেছে। ভোররাতে শশীকর্তা মারা গেছেন।”

“বলিস কী?”

“মা কালীর দিব্যি। গাঁ সুদ্ধু লোক কাঁদছে আর বলছে, এবার গাঁয়ের বাস তুলে দিতে হবে।”

দিনু একটু হেসে বলল, “না, না, কারও ভয় নেই। যদি দিনু রাজাকে ঠিকমতো খাজনা দেয় এবং মেনে চলে, তা হলে কারও কোনও ভয় নেই। ভীম দাস, গৌরহরি, জটেশ্বর, সবাইকে আমি ঢিট করে দেব।”

“বটে !”

“তবে আর বলছি কী? যা, গিয়ে কুঞ্জপুকুরে কথাটা প্রচার করে আয়।”

ঝিকু রওনা হয়ে পড়ছিল। দিনু ডেকে বলল, “ওরে, ওরকম ছেড়াখোঁড়া পোশাকে গেলে তোর কথার দামই কেউ দেবে না। দাঁড়া, ভাল পোশাক পরে যা।

আর কী বলছি, তাও শিখে যা।”

“ভাল পোশাক পাব কোথায়?”

ভাল পোশাকের অবশ্য অভাব হল না। দিনুর ফরমাশে হাত গিয়ে কোথা থেকে ঝলমলে পোশাক নিয়ে এল। একটা ঘোড়াও জোগাড় হয়ে গেল ! মায় কোমরে একটা তলোয়ার অবধি।

ঝিকু গিয়ে যখন কুঞ্জপুকুরে ঘোড়া দাবড়িয়ে ঢুকল, তখন লোকে অবাক, জরির পোশাক পরা ঘোড়সওয়ার তারা কখনও দেখেনি।

ঝিকু ঘোড়ায় বসেই চিৎকার করে ঘোষণা করল, “আমি দিনুরাজার কোটাল ঝিকু। আপনারা মন দিয়ে শুনুন! এখন থেকে যাঁরা দিনুরাজাকে নিয়মিত খাজনা দেবেন, তাঁদের কোনও ক্ষতি হবে না। দিনুরাজা তাঁদের রক্ষা করবেন। কুঞ্জপুকুর এবং আশপাশের দশখানা গাঁ নিয়ে আপাতত দিনুরাজা তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। রাজ্যের পরিধি আরও বাড়বে। রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে। কিন্তু বেয়াদবি করলে বিপদ হবে, আগেই বলে দিচ্ছি।”

লোকে এই ঘোষণা শুনে থ’ হয়ে গেল। শুধু অবাক হলেন না কবরেজমশাই। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। দিনু বিশ্বেস যে হাতটাকে কাজে লাগিয়ে ফেলেছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। এর জন্য তিনিও পাপের ভাগী ।

ঝিকু ঘোষণা করল, “কুঞ্জপুকুরের উত্তর দিকে এক মাইল দূরে দিনুরাজার প্রাসাদ তৈরি হচ্ছে। রাজামশাই এখন সেখানেই তাঁবুতে অবস্থান করছেন। যাঁরা দেখা করতে যাবেন, পাঁচ টাকা নজরানা নিয়ে যাবেন। আর কয়েকদিন বাদেই তাঁর দরবারও শুরু হবে। মামলা-মকদ্দমার বিচার এখন থেকে তিনিই করবেন।”

পাঁচ

কবরেজমশাই সকালেই খবর পেলেন, শশীবাবু মারা গেছেন। প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে যখন শশীবাবুর বাড়িতে হাজির হলেন, তখন ভিড় জমে গেছে বাইরে। কান্নাকাটি পড়ে গেছে। নন্দ কবিরাজের বুকের ভেতরটা হাহাকারে ভরে যাচ্ছিল। নিমিত্তের ভাগী কি তিনিই হলেন?

ভির ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখেন, গাঁয়ের মাতব্বররা সব শোকাতুর মুখে দাঁড়িয়ে। শুভ্র শয্যায় শশীবাবু শয়ান। মুখটা একটু কাত হয়ে আছে। একজন মস্ত চেহারার রক্তাম্বর পরা, জটাজুটধারী তান্ত্রিক মাথার কাছে বসা। তাঁর পায়ের কাছে পড়ে কাঁদছে ক্ষান্তমণি আর বলছে,"আমার বাবাকে বাঁচিয়ে দিন, বাঁচিয়ে দিন।"

তান্ত্রিক দুঃখের গলায় বললেন, "তাই কি হয় মা, প্রাণপাখি একবার উড়ে গেলে আর কি খাঁচায় ফেরে? তবে বড় অকালেই চলে গেল শশী। এইটুকু দেখেছিলুম। কতই বা বয়স তখন, সাত-টাত হবে। ওর উপনয়নে আমিই তো ছিলাম আচার্যগুরু।

সাবিত্রীমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলাম। এই একশো নব্বই বছর বয়সে আমি তো দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছি, পাহাড়ে উঠছি, কাঠ কাটছি, দিনে দশ-বারো ক্রোশ হাঁটছি। আর দ্যাখো, কচি বয়সেই শশীটা চলে গেল। তাও স্বাভাবিক মৃত্যু হলে দুঃখের তেমন কিছু ছিল না, কিন্তু মরলও তো অপঘাতে কিনা, গতি কী হবে কে জানে?"

নন্দ কবিরাজ অবাক হয়ে বললেন, "অপঘাতে?"

এবার তান্ত্রিক তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি কে গো খোকাটি?"

ক্ষান্তমণি বলল, "উনি কবরেজমশাই। বাবার চিকিৎসা উনিই করছিলেন।"

"বাঃ বাঃ। তা এসো, দেখে যাও শশীকে। তোমার চিকিৎসা তো কাজে লাগল না বাবা, শশীকে আজ ভোররাতে কে যেন গলা টিপে মেরে রেখে গেছে। গলায় আঙুলের দাগ একেবারে স্পষ্ট।"

নন্দ কবিরাজ ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। গ্রানিতে তাঁর ভেতরটা ভরে যাচ্ছে। কোনওক্রমে গিয়ে শশীবাবুর নাড়িটা দেখলেন। নেই। নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখলেন। শ্বাস চলছে না। গলাটা একটু ঝুঁকে দেখলেন। কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল। গলায় মোটা-মোটা আঙুলের স্পষ্ট দাগ। ও হাত যে কোন হাত, তা তাঁর চেয়ে ভাল আর কে জানে!

তান্ত্রিক বললেন,"তোমরা আর মরা মানুষের ঘরে ভির কোরো না। শশীর অপঘাতে মৃত্যু হওয়ায় আমি ওর মৃতদেহ কিছু সংস্কার করব, যাতে ওর আত্মার সদ্‌গতি হয়। অন্তিম সংস্কারও আমিই করব । আমার চারজন চেলা বাইরে অপেক্ষা করছে, তারাই আজ রাতে শ্মশানে নিয়ে যাবে।

নন্দ কবিরাজ কাঁপতে-কাঁপতে এবং কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি ফিরে এলেন। দুঃখের মধ্যে একটাই আশার আলো। এবার হয়তো বদমাশ দিনু বিশ্বাস তাঁর

নাতি বাবলুকে ফেরত দেবে।

সকালবেলায় যখন একজন ঘোড়সওয়ার এসে গাঁয়ে দিনুর রাজা হওয়ার কথা ঘোষণা করতে লাগল, তখন কবরেজমশাই বুঝতে পারলেন, হাতটাকে দিনু সত্যিই কাজে লাগিয়ে ফেলতে পেরেছে। এর পরিণাম যে কী ভয়াবহ, তা ভেবে শিউরে উঠলেন তিনি। নিজের অবিমৃশ্যকারিতাকে ধিক্কার জানাতে লাগলেন বারবার।

লোকটা যখন কুঞ্জপুকুরে চক্কর দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল, তখন বাঁশবনের কাছে তাকে ধরলেন নন্দ কবিরাজ। পথ আটকে দাঁড়িয়ে বললেন, “ওহে বাপু, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।”

“দিনু আমার নাতিকে চুরি করেছিল। দুটো শর্তে ফেরত দেওয়ার কথা। শর্ত দুটোই পূরণ হয়েছে। কিন্তু আমার নাতি কই?”

ঝিকু ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। তারপর কাছে এসে চাপা গলায় বলল, “এরকম আহাম্মক লোক আর দেখিনি, বুঝলেন। একেবারে আকাট।”

“কে? কার কথা বলছ?”

ঝিকু গলা আরও এক পরদা নামিয়ে বলল, “দিনুদাদার কথাই বলছি। রাজা-গজা মানুষ, প্রকাশ্যে তাঁর নিন্দে করলে গর্দান যাওয়ার ভয় আছে। তবু না বলেও পারছি না। অমন ফুটফুটে নাতি আপনার। ওর দাম কি মোটে দুশো টাকা?”

নন্দ কবিরাজ হাঁ হয়ে গিয়ে বললেন,"কী বলছ বাপু?”

“সেই কথাই তো বলছি। ওরকম ছেলের এ-বাজারে হেসে-খেলে দু থেকে পাঁচ হাজার টাকা অবধি দর উঠবে। আর দিনুদাদা মাত্র দুশো টাকায় বেদেদের কাছে বাচ্চাটাকে বিক্রি করে দিল।”

নন্দ কবিরাজ কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, “বেদেদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে? বেদেদের কাছে…”

“বলে কিনা, উটকো ঝামেলা ঘাড়ে রাখতে চাই না, তাই শস্তায় বেচে দিলাম। সে না হয় হল। কিন্তু দরটা অমন কম করে বলার মানে হয়? আপনিই বিবেচনা করে দেখুন না, আপনারই তো নাতি, হেসে-খেলে দুটি হাজার টাকা আদায় হত না? এই বুদ্ধি নিয়ে উনি চালাবেন রাজত্ব ! তবেই হয়েছে।”

কিন্তু নন্দ কবিরাজের কানে ঝিকুর আর কোনও কথাই ঢুকল না। তিনি মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

ঝিকু মাথা নেড়ে বলল, “দুঃখ হওয়ারই কথা। অমন নাতি এত শস্তায় বিক্রি হয়ে গেছে শুনলে কোন দাদুর না দুঃখ হয়?”

এই বলে ঝিকু ঘোড়ায় চেপে চলে গেল। মূর্ছা ভেঙে নন্দ কবিরাজ উঠলেন আরও আধঘণ্টা পরে। শরীরটা কাঁপছে। মন ভারাক্রান্ত। বুকও ভার হয়ে গেছে। ভাবলেন, বাড়ি ফিরে গিয়ে বিষ খাবেন আজ। তারপর ভাবলেন, নিজের কর্মদোষে যখন এত ঝামেলা পাকিয়ে তুলেছি, তখন মরার আগে এই জট না ছাড়িয়ে মরছি না।

দুর্বল শরীরটা টেনে তুললেন নন্দ কবিরাজ। তারপর বাড়ি ফিরে একটা বলকারক পাঁচন তৈরি করে খেয়ে নিলেন। পাঁচনের গুণেই হোক, বা তীব্র অনুতাপের দরুনই হোক তাঁর শরীর আর মনের দুর্বলতা কেটে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। চোখ দুটো জ্বালা করছিল।

হুট করে আর কিছু করে বসবেন না বলে ঠিক করলেন তিনি । ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে। ভেবে তবেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

দিনকয়েক যেতে-না-যেতেই খবর পাওয়া গেল, রাজ্যের গুণ্ডা-বদমাশ, চোর-ডাকাত সব গিয়ে দিনুরাজার আস্তানায় জুটেছে। মোটা নজরানা দিয়ে তারা বশ্যতাও স্বীকার করে নিয়েছে । গাঁয়ের মেলা লোকও রোজ নজরানা নিয়ে দিনুরাজাকে সেলাম ঠুকে আসছে। তাদের নামধাম সব টুকে নেওয়া হয়েছে একটা জাবদা খাতায়, যাদের নাম উঠছে, দিনুরাজা তাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছে। রাজবাড়িও প্রায় শেষ হয়ে এল । হাতের কেরামতিতে ধাঁ-ধ করে বাড়ি উঠে গেছে । গম্বুজ বসালেই হয় । হস্তশিল্পী গৌরহরিকে মন্ত্রী করা হয়েছে । ভীম দাস হয়েছে সেনাপতি । জটেশ্বরকে দেওয়া হয়েছে প্রজাদের কাছ থেকে
খাজনা আদায়ের ভার ।

একদিন সকালে হস্তদন্ত হয়ে এসে সদাশিব দারোগা কবিরাজমশাইকে জিজ্ঞেস করল, "নন্দবাবু, দৌবারিক কথাটার মানে কী বলুন তো?"

"দৌবারিক কথাটার মানে? কেন বলুন তো?"

"আজ্ঞে, বড্ড ঠেকায় পড়ে গেছি। দিনুরাজা আমাকে তাঁর প্রধান দৌবারিক করতে চেয়ে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। আমিও রাজি হয়ে গেছি। কিন্তু মুশকিল হল, দৌবারিক কাকে বলে সেটাই জানি না।"

"আপনি কি দিনুর জাবদা খাতায় নাম লিখিয়ে এসেছেন নাকি?"

সদাশিব কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন,"কী করব কবরেজমশাই! বদলির দরখাস্ত করেছিলাম, তা সরকার বাহাদুর আমার দরখাস্ত নামঞ্জুর করে দিয়েছেন। এ তল্লাটে যদি থাকতেই হয়, তা হলে দিনুরাজার কাছে মাথা না মুড়িয়ে থাকব, আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা? জানেন তো, দিনুরাজা যে জায়গায় রাজবাড়ি করেছেন, তার দু'জন দাবিদার এসে হাজির হয়েছিল। দিনুরাজার পাইক-বরকন্দাজরা তাদের গর্দান নিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলতে গিয়েছিল। তারা তখন চিঁ-চিঁ করতে-করতে গোটা জমিটা দিনুরাজার নামে দানপত্র লিখে সই করে দিয়ে গেছে। নয়াগঞ্জের কুস্তিগির বীরবাহাদুর নজরানা না নিয়ে দিনুরাজার সামনে গিয়েছিল বলে তাকে কান ধরে পাবলিকের সামনে ওঠাবসা করানো হয়েছে। শুনতে পাচ্ছি, শশীবাবুর হাতটা নাকি এখন দিনুরাজার হাতে। তার জোরেই এতসব হচ্ছে। তা, নাম না লিখিয়ে কী করি বলুন!"

কবরেজমশাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তা হলে দৌবারিক কথাটার মানে না জানাই আপনার পক্ষে ভাল। গাঁয়ের লোকও বেশিরভাগই মানেটা জানে না। চাকরিটা বরং নিয়েই ফেলুন।"

“মানেটা কি খুব খারাপ কবরেজমশাই?”

“মাইনেটা যদি ভাল হয়, তা হলে মানেটা খারাপ হলেই বা কী যায়-আসে?”

সদাশিব একগাল হেসে বললেন, “আজ্ঞে, মাইনেটা খুবই ভাল। আপাতত দু হাজার টাকা। উপরি আছে। ক্ষমতাও মেলা।”

“তা হলে আর কী ! লেগে যান কাজে।”

“আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে একটু যেন রেগে আছেন। তা আমি বলি কি কবরেজমশাই, রাগটাগ করে লাভ নেই। অবস্থা বুঝেই তো ব্যবস্থা করতে হয়। শশীবাবুর হাতটা কীভাবে দিনুরাজার হাতে চলে গেল, তা আমরা জানি না। কিন্তু যখন গেছে, তখন হাকিম সাহেবের হুকুম না মেনে কি উপায় আছে? বলুন আপনি।”

কবরেজমশাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “শশীবাবুর হাত আজ খারাপ একটা লোকের হাতে গেছে বলেই কি আমাদেরও খারাপ হতে হবে সদাশিববাবু?”

সদাশিব একটু বিমর্ষ হয়ে বললেন, “শুধু আমাকেই কেন দুষছেন কবরেজমশাই? আপনি কি জানেন, স্কুলের হেডসার হয়েছেন দিনুরাজার শিক্ষামন্ত্রী, হেডপণ্ডিতমশাই গতকালই দিনুরাজার সভাপণ্ডিতের চাকরিতে জয়েন করেছেন, বিজ্ঞানের মাস্টার রতন বোস হয়েছেন সভা-প্রযুক্তিবিদ। দিনুরাজা একটা উড়ন্ত চেয়ারে বসে মাঝে-মাঝে গগনপথ থেকে তাঁর রাজ্যের এরিয়েল সার্ভে করবেন। রতন বোস তাঁর চেয়ারে সিটবেল্টের ব্যবস্থা করছেন। দশটা গাঁয়ের আরও কত মানুষ চাকরির আশায় দিনুরাজার দরবারে ঘুরঘুর করছে, তার হিসেব নেই।”

কবরেজমশাই একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, “বট !”

“শুনছি, আপনাকে রাজবৈদ্য করার প্রস্তাব নিয়ে লোক এল বলে?”

কবরেজমশাইয়ের মুখটা রক্তাভ হয়ে গেল রাগে। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, “পাষণ্ডটা আর কী করতে চায়?”

সদাশিব একটু হেসে বললেন, “দিনুরাজা মনে করেন, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি আনঅগানাইজড ক্রাইম। ওতে সমাজে বিশৃঙ্খলাই বাড়ে। তাই তিনি একটা সংগঠিত দল তৈরি করছেন। যারা নিয়মিত নজরানা এবং খাজনা দেবে, তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করা হবে না। কিন্তু যারা তা দেবে না, তাদের ঘটিবাটি চাঁটি করার সংগঠিত ব্যবস্থা হবে। যারা তবু বশ মানবে না, তাদের রাজদরবারে নিয়ে গিয়ে বিচার করা হবে। জেল, জরিমানা, বেত্রাঘাত, শূল, সব ব্যবস্থাই হচ্ছে।”

কবরেজমশাই এবার আরও একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, “কথাটা এতক্ষণ বলতে একটু বাধো-বাধো ঠেকছিল। কিন্তু মনে হচ্ছে, বলে দেওয়াই ভাল। শুনতে যখন চাইছেন তখন বলি, ‘দৌবারিক কথাটার মানে হল দরোয়ান।”

“দরোয়ান?” বলে সদাশিব হাঁ হয়ে রইলেন।

কবরেজমশাই উঠে গিয়ে বাংলা অভিধানটা নিয়ে এসে খুলে দেখিয়ে বললেন, “আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তো এই দেখুন। এখন ভেবে দেখুন,

দারোগা থেকে দরোয়ান হতে আপনার কেমন লাগবে ?”

সদাশিব অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে অভিধানের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, “কী ! আমাকে এত বড় অপমান! এখনই আমি ব্যাটাকে ধরে থানায় এনে লক-আপে পুরে দিচ্ছি।”

কবরেজমশাই অনুত্তেজিত গলায় বললেন, “মাথা গরম করবেন না। তাতে কাজ পণ্ড হবে। ঠাণ্ডা হয়ে বসুন।”

সদাশিব ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, “এর পরও ঠাণ্ডা হতে বলছেন? কী স্পর্ধা দেখছেন লোকটার?”

“দেখছি। তবু মাথা গরম করবেন না। মনে রাখবেন, লোকটার হাতে শশীবাবুর হাত আছে। আমাদের সাধ্য নেই তার সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করার। কিন্তু কৌশলে সবই হয়।”

“আমাকে কী করতে বলেন আপনি?”

কবরেজমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন, “গায়ের জোর বাড়াতে বলি। আজ থেকেই খাওয়াদাওয়া ছাঁটকাট করতে হবে। রোজ ব্যায়াম করতে শুরু করুন। যখন প্রথম এ তল্লাটে এসেছিলেন, তখন আপনার বেশ মুগুরভাজা চেহারা ছিল। মুগুর আবার ধরুন। আর যারা এখনও দিনুর দলে নাম লেখায়নি তাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করতে থাকুন। আমাদেরও জোট বাঁধার সময় এসেছে।”

“যে আজ্ঞে !”

“চণ্ডীমণ্ডপে কালই আমরা মিটিং করব। একটু বেশি রাতের দিকে। বুঝলেন?”

সদাশিব এখনও রাগে গরগর করছেন, বললেন, “যে আজ্ঞে। ”

রাগে ফুসতে ফুসতে সদাশিব বিদায় নিলেন। পরদিন সকালবেলায় দশ গাঁয়ের লোক অবাক হয়ে দেখল শূন্যপথে খুব ধীরে ধীরে একটা সিংহাসনের মতো জিনিস ভেসে যাচ্ছে। তাতে বসে আছে দিনুরাজা। পরনে জরির পোশাক, মাথায় ঝলমলে মুকুট, হাতে একটা রাজদণ্ড আর মুখে একটু হাসি। ওপর থেকে সে মাঝে মাঝে বরাভয়ের ভঙ্গিতে হাত তুলছিল।

এই দৃশ্য দেখে অনেকেই সোল্লাসে জয়ধ্বনি দিল, “জয় দিনু মহারাজের জয়!”

আবার অনেকে মুখ কালো করে আড়ালে সরে পড়ল। দিনুরাজার উড়ন্ত সিংহাসন প্রথমেই এসে নামল কুঞ্জপুকুরের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে। মুহূর্তের মধ্যে চারদিক ভিড়ে ভিড়াক্কার হয়ে গেল। সবাই দেখতে পেল, সিংহাসনটা ধরে রয়েছে শশীদাদুর সেই বিখ্যাত হাত।

মোলায়েম গলায় বলল, “ভাইসব, আপনারা আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছায় চারদিকে আজ শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করছে। চুরি, ছাঁচড়ামি, ডাকাতি, রাহাজানি, গুণ্ডামি সব বন্ধ। রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হতে আর দেরি নেই। এটা জনগণেরই জয়, আমি আপনাদের

সামান্য সেবক হিসেবে আমার সামান্য সীমায়িত ক্ষমতায় যেটুকু করতে পেরেছি, তাও আপনাদেরই সহযোগিতায়। জনগণেরই বিশেষ অনুরোধে নিতান্তই অনিচ্ছায় আর ঠিক কুড়ি দিন বাদে মাঘী পূর্ণিমার দিন এই অধমকে জনগণ সিংহাসনে অভিষিক্ত করবেন বলে মনস্থ করেছেন। রাজার মুকুট মাথায় দেওয়া মানে আসলে কাঁটার মুকুট পরা। তবু আমি আপনাদের মুখ চেয়ে রাজি হয়েছি। ওইদিন আপনারা আপামর জনসাধারণ দয়া করে অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন, এই প্রার্থনা কুঞ্জপুকুরে নেমন্তন্ন করতে আমি নিজেই এসেছি, কারণ এই গ্রামের সঙ্গে আমার অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে।”

সবাই জয়ধ্বনি করল, হাততালিও পড়ল। হাসি-হাসি মুখে দিনুরাজা ফের সিংহাসনে বসল। সিংহাসন শূন্যে উঠে ভেসে চলে গেল!

একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সদাশিব দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, “দেখলেন কবরেজমশাই?”

কবরেজমশাই বললেন, “দেখলাম। আঙুল ফুলে কলাগাছ!”

“ইচ্ছে করছিল পিস্তলটা তুলে গুলি চালিয়ে দিই।”

“তাতে লাভ হত না, পিস্তল তুলবার আগেই হাত এসে পিস্তল কেড়ে নিত। গুলি চালাতে পারলেও দিনুর গায়ে লাগত না, সে বেঁটে মানুষ, লোকজন ঘিরে ছিল তাকে। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন সদাশিববাবু।”

“যে আজ্ঞে। আজ সকালে আমি মাইলটাক দৌড়েছি। খাওয়া অর্ধেক করে ফেলেছি, ডন-বৈঠক শুরু করে দিয়েছি।”

“খুব ভাল।”

"আর দিনু-বিরোধী লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগও করে ফেলেছি। আজ রাত বারোটার পর চণ্ডীমণ্ডপে মিটিং। অন্ধকারেই মিটিং হবে।”

“বাঃ, আপনি তো আগের মতোই করিৎকম হয়ে উঠেছেন!”

“যে আজ্ঞে।”

নিশুতরাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ল। কুয়াশায় চারদিক আবছা। তার মধ্যেই গুটিগুটি বারো-চোদ্দজন লোক এসে অন্ধকার চণ্ডীপণ্ডপে জড়ো হল। সকলেই কেমন মনমরা, হতাশ আর জবুথবু।

কবরেজমশাই উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত গলায় বললেন, “আপনাদের মনের অবস্থা আমি জানি। আমরা সবাই আজ এক বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে আছি। আগে আমার একটা অপরাধের কথা স্বীকার করে নিই।”

সবাই অন্ধকারেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কবরেজমশাই অকম্পিত কণ্ঠে তাঁর নাতির জন্য হাত চুরি করা এবং তা দিনুর হাতে তুলে দেওয়ার বৃত্তান্ত খোলসা করে বললেন। কিছুই লুকোলেন না, সবশেষে বললেন, “অপরাধ আমার। প্রায়শ্চিত্তও আমাকেই করতে হবে। দিনুর অভিষেকের দিনটাকেই আমার পছন্দ। আমার অনুরোধ, আপনারাও সকলে ওইদিন অভিষেকে উপস্থিত থাকবেন। যা হওয়ার ওইদিনই হবে।”

কে একজন মুখ ঢেকে বসে ছিল একটা থামের আড়ালে, সে হঠাৎ ফ্যাসফাসে গলায় বলল, "আপনার নাতি কি ফেরত এসেছে?"

"না। তার আশা ছেড়ে দিয়েছি, দিনু তাকে দুশো টাকায় বেদেদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। সেই বেদের দল এ তল্লাট ছেড়ে কোথায় চলে গেছে, কেউ জানে না।"

সবাই চঞ্চল হয়ে উঠল। অনেকেই ক্রোধ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল। কবরেজমশাই শান্ত কণ্ঠে বললেন, "আমারই পাপের শাস্তি। আপনারা উত্তেজিত হবেন না। তবে সকলেই প্রস্তুত থাকুন। যাঁরা এখনও দিনুর কাছে মাথা নোয়াননি, তাঁরা দয়া করে মাথা নোয়াবেন না। ভরসা রাখুন। ঠাকুর মঙ্গলময়।"

"থামের আড়ালে মুখ ঢেকে একটা লোক বসে ছিল, আমাকে আমার নাতির কথা জিজ্ঞেস করল। কে বলুন তো?"

"আমিও ঠিক চিনতে পারলাম না। মিটিং শেষ হওয়ার আগেই সরে পড়ল।"

"দিনুর স্পাই নয় তো?"

সদাশিব দুশ্চিন্তায় পড়ে বললেন, "আশ্চর্যের কী? হতেই পারে।"

কবরেজমশাইয়ের কয়েকদিন নাওয়া-খাওয়া রইল না। নানারকম পাঁচন তৈরী করে দিনু-বিরোধীদের বাড়ি বাড়ি পাঠাতে লাগলেন।

একদিন সকালবেলা ঝলমলে পোশাক-পরা ঝিকু ঘোড়ায় চেপে এসে হাজির হল।

"পেন্নাম হই কবরেজমশাই, দিনুমহারাজ পাঠালেন।"

কবরেজমশাই স্মিতহাস্যে বললেন, "কী খবর হে ঝিকু কোটাল?"

"আজ্ঞে, খবর সুবিধের নয়। যত রাজ্যের গুণ্ডা-বদমাশ এসে রোজ ভিড় করছে। আমি তেমন পাত্তাই পাচ্ছি না। মহারাজের ফাই-ফরমাশ খেটে খেটে জান কয়লা হচ্ছে। এই কি কোটালের কাজ, কবরেজমশাই? ছাঃ ছাঃ।"

কবরেজমশাই আদর করে ঝিকুকে ঘরে এনে বসালেন। বললেন, "বোসো, বোসো, একটু জিরিয়ে নাও।"

তা ঝিকু বসল, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কোটালের কাজ ঝিকু বিশেষ পছন্দ করছে না। কপালের ঘাম মুছে বলল, "কোটাল মানে কি ভৃত্য নাকি কবরেজমশাই? ওসব শক্ত-শক্ত কথা, মানেও জানি না !"

"না হে, কোটাল ভৃত্য হবে কেন? মস্ত সম্মানের কাজ। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে রাজার সমানই, সে হল আইনের রক্ষক। মানুষের ধনপ্রাণ তো সেই রক্ষা করে। বীরকে বীর, সাহসীকে সাহসী।"

"ধুর মশাই, কোথায় কী? আমাকে তো বীরের কাজ কিছু দেওয়াই হয় না। কেবল এটা আন, ওটা দিয়ে আয়, অমুককে একটা খবর দে, একটা পান সেজে আন, এইসব।"

"তা হলে তো খুবই দুঃখের কথা!"

"খুবই দুঃখের। একটু আদর-যত্নও তো পাওয়া যায় না। পান থেকে চুন খসলেই দাবড়ায়।"

"তা হলে তো আফসোসের কথাই ঝিকু। এভাবে তো চলবে না।"

"চলছে না মশাই, একদম চলছে না। আগেই ভাল ছিলুম।"

"আগে কী করতে বাপু?"

"বাপের জমি আছে। চাষবাস করতুম। বেশ ছিলুম তখন। দিনুদাদা গিয়ে কানমন্ত্র দিয়ে নিয়ে এল। রাজা হল বটে, কিন্তু সে তো নিজের এলেমে নয়, শশীবাবুর হাতের দৌলতে, রাজা হয়েই একেবারে ধরাকে সরা দেখতে লেগেছে, এখন কাদের খাতির জানেন? ওই ভীম সর্দার, গৌরহরি, জটেশ্বর, এরাই সব পেয়ারের লোক। আমি যেন ভেসে এসেছি।"

এই বলে ঝিকু একখানা চিঠি বের করে কবরেজমশাইয়ের হাতে দিয়ে বলল, "আপনাকেও কোন ফেরেববাজিতে ফেলে দেখুন। রাজবৈদ্য হতে ডেকেছে। দু হাজার টাকা মাইনে আর উপরি। দু হাজার টাকা মাইনে আমারও, কিন্তু আজ অবধি দুশোটি টাকাও পাইনি। যা পাচ্ছে, সব রাজকোষে জমা করে নিচ্ছে। আপনার বেলাতেও তাই হবে দেখবেন।"

কবরেজমশাই চিঠি খুলে দেখলেন, দিনুরাজা পরম বিনয়ের সঙ্গে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে তাঁকে রাজবৈদ্য হিসেবে নিয়োগ করতে চেয়েছে। কবরেজমশাই চিঠিটা রেখে দিয়ে বললেন, "দিনুকে বোলো, অভিষেকটা ভালয়-ভালয় হয়ে যাক, তারপর রাজবৈদ্যের চাকরি নেব। অভিষেকে তো যাচ্ছিই, তখন কথা হবে।"

"যে আজ্ঞে! আচ্ছা কবরেজমশাই, এটা কেমন নিয়ম বলুন তো! রাজামশাইয়ের সব কর্মচারীরই মাইনে দু হাজার টাকা করে? কেউ অবশ্য দু হাজার পায় না। কিন্তু বলা তো থাকছে।"

"খুব আশ্চর্য কথা! যেখানে মুড়ি-মিছরির এক দর, সেখানে খুব অরাজকতা বলেই ধরতে হবে। তা, রাজবাড়িতে খাওয়াদাওয়া কেমন?"

"সে আর বলবেন না। রাজা হওয়ার পর থেকেই দিনুদাদা এমন কেপ্পন হয়েছে যে, ডাল, ভাত আর ঘাট ছাড়া কর্মচারীদের আর কিছু জুটছে না। ওদিকে হাত-বাবাজিকে রোজই এখান থেকে সেখান থেকে চুরি-জোচ্চুরি করে আনার কাজে লাগাচ্ছে। কয়েক দিনে লাখো-লাখো টাকা করে ফেলল মশাই! যত দেখি তত রক্ত গরম হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, দিই তলোয়ারের একটা কোপ বসিয়ে ঘাড়ে, তারপর যা হওয়ার হবে। কিন্তু ভয় ওই হাত-বাবাজিকে। গোবিন্দ কী একটু বেয়াদবি করেছিল, হাত বাবাজির কী উস্তম-কুস্তম মার! যায়-যায় অবস্থা । ফটিককে এই শীতের রাতে পুকুরে চুবিয়ে আনল। অপরাধ কী, না সে খিদের মুখে, একটা কলা চুরি করে খেয়েছে। রাজামশাইয়ের খাওয়ার সময় কাজের লোক হাঁচি দিয়েছিল মশাই, তাকে চুল ধরে একটি ঘণ্টা শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছিল। অত্যাচারের শেষ নেই। চাষিদের ঘরের ধান, চাল, সবজি, দুধ, মাছ,

সব ওই হাত-বাবাজিকে দিয়ে কেড়ে আনছে। তল্লাটের সব দোকানপাট লুট হয়ে গেছে। লোকে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালানোর পথ খুঁজছে।”

“তোমরা তবু চুপ করে আছ?”

“কী করব কবরেজমশাই! ওই হাত-বাবাজির ভয়ে কিছু করার উপায় নেই কিনা!”

কবরেজমশাই যত শুনছেন, তত ভেতরে-ভেতরে খুশি হচ্ছেন। এই তো চাই। এ রকমই তো চাই। তিনি ভাল করে ঝিকুকে মণ্ডা-মিঠাই খাইয়ে বিদায় দেওয়ার সময় কানে-কানে বললেন, “প্রস্তুত থেকো, অভিষেকের দিন সুযোগ আসবে।”

“যে আজ্ঞে!”

অভিষেকের দিন এগিয়ে আসতে লাগল। সদাশিববাবু তাঁর সেপাইদের নিয়ে রোজ লেফট-রাইট করছেন। ডন-বৈঠক কসরত চলছে। ঘরে-ঘরে পাঁচন পৌঁছে যাচ্ছে। দিনু-বিরোধীরা গায়ে বেশ জোর এবং ফুর্তি পাচ্ছেন।

দেখতে না দেখতেই মাঘী পূর্ণিমা এসে পড়ল। দশটা গাঁয়ের লোক সেজেগুজে ভোর থাকতেই রওনা হয়ে পড়ল রাজবাড়ি।

রাজবাড়ি দেখে সকলেই থ। চারদিকে জঙ্গল হাসিল করে বিরাট সাতমহলা বাড়ি উঠেছে। প্রাসাদের মাথায় সোনার চুড়ো। চারদিকে ফুলের বিরাট বাগান। মস্ত দিঘি। মৃগদাব। হাতিশালে হাতি। আস্তাবলে ঘোড়া। চারদিক ঝকঝক, তকতক করছে। বিশাল শামিয়ানার নিচে অতিথিদের জন্য সার-সার চেয়ার। নিচে গালিচা বিছানো। একটা বেদির ওপর নতুন সোনার মুকুট। সোনার রাজদণ্ড। গোলাপজল আর আতরের গন্ধে চারদিক মাত।

বিশিষ্ট গণ্যমান্য অতিথিদের চেয়ারে বসানো হল। সাধারণ লোকেরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল ভিড় করে। ঘন-ঘন দিনুরাজার নামে জয়ধ্বনি উঠছে। রাজকর্মচারীদের ছোটাছুটির বিরাম নেই।

বেলা দশটা বাজতেই দিনুরাজা এসে সিংহাসনের পাশে একটা নিচু আসনে বসল। চারদিক ফেটে পড়ল জয়ধ্বনিতে। দিনুরাজা হাসি-হাসি মুখ করে হাত তুলে সকলের অভিনন্দন গ্রহণ করল।

এর পরই উঠলেন রাজপুরোহিত চন্দ্রমাধব। লম্বা, রোগাটে চেহারা। দুধসাদা দাড়ি-গোঁফ, শ্বেতশুভ্র লম্বা চুল। তাঁর চেহারাটা অনেকেরই চেনা-চেনা মনে হল। কিন্তু শোনা গেল, ইনি এ-অঞ্চলের লোক নন। তিব্বত থেকে এসেছেন। মস্ত সাধক! শশীবাবুর হাতই তাঁকে সংগ্রহ করে এনেছে।

স্বস্তিবাচন পাঠের পর চন্দ্রমাধব জলদ গম্ভীর স্বরে বললেন, “আজ বড় আনন্দের দিন। আজ আমাদের দিনু বিশ্বেস এই রাজ্যের রাজা হচ্ছেন।”

তুমুল হর্ষধ্বনি ।

দিনু-বিরোধীদের নিয়ে কবরেজমশাই সামনের দিকে দ্বিতীয় সারিতে বসে ছিলেন। কবরেজমশাই পাশে-বসা সদাশিবকে কনুই দিয়ে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন, “তৈরি থাকবেন।”

“আছি। হাতে পিস্তল সেপাইরা বেদির পেছনে লুকিয়ে আছে।”

“বাঃ।”

রাজপুরোহিত চন্দ্রমাধব তাঁর লম্বা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন,“আমি জানি , দিনু বিশ্বেসকে অনেকেই পছন্দ করে না। কিন্তু আজ আমি তাদের সাবধান করে দিচ্ছি যে, কোনও হঠকারিতা করবেন না। দিনুর একখানা ঈশ্বরদত্ত জিনিস আছে। হঠকারিতা করলে রেহাই পাবেন না।”

সদাশিব বললেন, “আর তো সহ্য হচ্ছে না কবরেজমশাই!”

“আর একটু। রাজপুরোহিতটা কে বলুন তো! চেনা-চেনা লাগছে।”

“সে আমারও লাগছে। কিন্তু এখানকার লোক নয়।”

চন্দ্রমাধব বললেন, “দিনু বিশ্বেস আজ রাজা হয়েছে, এ অতি আনন্দের কথা। কিন্তু আপনারা অনেকেই দিনু বিশ্বেসের অতীতকে জানেন না। কোন সামান্য অবস্থা থেকে সে আজ এক সংগ্রামী জীবনের ভেতর দিয়ে এতদূর পৌঁছেছে, তা রহস্যাবৃত অনেকেরই কাছে। আপনারা হয়তো জানেন না এই দিনু বিশ্বেস একসময়ে শশী গাঙ্গুলির বাড়িতে ভৃত্যের কাজ করত। একবার চুরি করে ধরা পড়ায়—”

দিনুর মুখখানা হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠে চন্দ্রমাধবকে চুপিচুপি কী যেন বলল। চন্দ্রমাধব বললেন, “আচ্ছা, আচ্ছা। সেসব কথা প্রকাশ করা দিনুর পছন্দ নয়। সুতরাং সেসব কথা আজ থাক।”

সবাই বলল, “সাধু, সাধু।”

চন্দ্রমাধব নিজের পাকা দাড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, “দিনুর জীবনটাই এক সংগ্রামী জীবন। সেই সংগ্রামী জীবনের অনেকটাই তাকে কাটাতে হয়েছে জেলখানায়। অন্ধ কারার অন্তরালে—”

ফের দিনু উঠে চন্দ্রমাধবকে কী যেন বলল।

চন্দ্রমাধব সামলে গিয়ে বললেন, “সে-কথাও আজ থাক। শুধু বলি, দিনুর কীর্তি আমাদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হয়েই থাকবে। কত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সে যে আজ এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। যে হাতের জোরে সে আজ এত ওপরে উঠেছে, সেই হাতও সহজে তার হাতে আসেনি। নন্দ কবিরাজের নাতিকে চুরি করে…”

এবার দিনু আর থাকতে না পেরে পেল্লায় একটা ধমক দিল, “চুপ করুন তো ঠাকুরমশাই। ভীমরতি ধরেছে নাকি?”

“তই তো! বুড়ো বয়সে মুখ বড় আলগা হয়ে যায় কিনা! তা সেসব গুহ্য কথাও আজ মুলতুবি থাক। আমি শুধু আজ দিনুকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করব।”

এই বলে চন্দ্রমাধব হাত বাড়িয়ে দিনুর মাথায় পরম স্নেহে হাত বোলাতে লাগলেন। বললেন, “দেখতে এইটুকু হলে কী হবে, সে একজন মস্ত মানুষ। ঠিক যেন ছোট্ট একটু বেলুন ফুলে এই এত বড় হয়েছে।”

শুনে সকলে হেসে উঠল।

দিনুর চোখ-মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। চন্দ্রমাধব সেদিকে খেয়াল না করেই বললেন, "আজ আনন্দের দিনে দিনুর অতীত ইতিহাসকে টেনে না আনাই ভাল। সে-ইতিহাস হয়তো সকলের পছন্দ হবে না। কিন্তু আমি আজ দৃঢ়কণ্ঠে দিনুর বিরোধীদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তারা যেন হুট করে কিছু করে না বসেন। দিনু চোর বা জোচ্চোর হতে পারে, নানারকম পাপের কাজও করে থাকতে পারে, তবু সে কিন্তু আজ রাজা।"

দিনু আর সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে বলে উঠল, "ওরে হাত, আয় তো। এই ব্যাটা পুরুতের গলাটা টিপে ধরে দে তো ঘা কতক।"

আদেশমাত্র সাঁ করে হাত চলে এল শূন্যপথে। কিন্তু হাত কিছু করার আগেই কবরেজমশাই আর সদাশিব লাফিয়ে উঠলেন। সদাশিব পিস্তল বাগিয়ে ধরে বললেন, "সাবধান দিনু, খুলি উড়িয়ে দেব।"

কবরেজমশাই ধাঁ করে গিয়ে হাতটাকে চেপে ধরে বললেন, "কিছুতেই রাজপুরোহিতের কোনও ক্ষতি করতে দেব না। কিছুতেই না।"

নিয়ম অনুযায়ী ওই কালান্তক হাতের সঙ্গে নন্দবাবুর এঁটে ওঠার কথাও নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, হাতটা তিনি চেপে ধরতেই হাতটা যেন তাঁর হাতে নেতিয়ে পড়ল।

চন্দ্রমাধব পাকা দাঁড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে সহস্যে বললেন, "আজ বড় আনন্দের দিন। দিনু-চোর রাজা হবে। আপনারা সবাই তো তাই চান, নাকি?"

হঠাৎ সভাস্থলে অনেকেই গর্জে উঠল, "না, চাই না। ও লোকটা ভয়ঙ্কর বদমাশ।"

"বদমাশ!" চন্দ্রমাধব দিনুর দিকে চেয়ে বললেন, "তাই নাকি?"

নানা কণ্ঠ বলতে লাগল, "ও একটা শয়তান ও ডাকাত। আমাদের ধান, চল লুট করে নেয়। টাকা-পয়সা কেড়ে নিয়ে যায়। দোকানের জিনিস তুলে নিয়ে যায়।"

দিনু লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে তার হাতকে বলতে লাগল, "ওরে হাত, ম্যাদামারা হয়ে আছিস যে বড়। সব ক'টাকে পিটিয়ে টিট করে দিয়ে আয়। যা বলছি শিগগির।"

কিন্তু হাত কবরেজমশাইয়ের হাতে দিব্যি জমিয়ে বসে রইল। নড়ল না।

রাজপুরোহিত হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে ইশারা করে বললেন, "হাত তো দেখি দিনুর কথা শুনছে না। তা এইবেলা কি দিনুর মাথায় মুকুটটা পরাব? আপনারা কী বলেন?"

"নাঃ, নাঃ কক্ষনো না!"

দিনু কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ চারদিকের পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বেদি থেকে একটা পেল্লায় লাফ মেরে পালানোর চেষ্টা করতেই সদাশিব তার ওপর গিয়ে পড়লেন।

তারপর দু-তিনটে রাদ্দা মেরে হাতে হাতকড়া পরিয়ে সেপাইদের হাতে দিয়ে বললেন, "সোজা লক আপে নিয়ে তোলো। আমি বাকি বদমাশদের দেখছি।"

চন্দ্রমাধব স্মিতহাস্যে বললেন, "আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। যার দেখবার, সেই দেখবে।"

বলে চোখের ইশারা করতেই কবরেজমশাইয়ের হাত থেকে শশীবাবুর হাত ছিটকে বেরিয়ে গেল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ভীম দাস, জটেশ্বর, গৌরহরি ইত্যাদি দশ-বারোটা বদমাশকে আধমরা করে নিয়ে এসে, দমাস-দমাস করে বেদির ওপর ফেলল।

কাণ্ড দেখে সবাই হতবাক ! পেছনে মানুষজন হর্ষধ্বনি করে উঠল।

হঠাৎ কবরেজমশাই সোজা গিয়ে চন্দ্রমাধবের পায়ের ওপর পড়ে বললেন, "চিনতে পেরেছি শশীখুড়ো। এ আপনি ছাড়া, আর কেউ নন?" বলে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

চন্দ্রমাধব তাঁর নকল দাড়ি-গোঁফ আর চুল খুলে ফেলতেই চারদিকে তুমুল চিৎকার উঠল, "শশীদাদু, শশীজ্যাঠা, শশীখুড়ো, শশীভায়া যে!"

শশীবাবু নন্দ কবিরাজকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "কোনও অপরাধ করোনি ভাই। তোমার অবস্থায় পড়লে যে-কোনও মানুষই এমনটি করত। বাবলুর জন্য চিন্তা কোরো না। আমার হাত গিয়ে আজ সকালেই তাকে উদ্ধার করে এনে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। বাড়ি গিয়েই তাকে দেখতে পাবে।"

"কিন্তু শশীখুড়ো, হাতটা যে দিনু বিশ্বেসের হয়ে গিয়েছিল!"

শশীবাবু স্মিতহাসে বললেন, "কোনওদিনই হয়নি। দিনু মন্ত্র জানত না। যে মন্ত্র বলেছিল, তাও ভুল। হাতটাকে আমিই বলেছিলাম ওর কথামতো চলতে।"

"কেন শশীখুড়ো?"

"তোমাদের এলেম পরীক্ষা করতে। আমার হাতের ওপর নির্ভর করতে করতে তোমাদের আত্মশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল কমে যাচ্ছিল নিজেদের ওপর নির্ভরতা। তাই অসুখের ভান করতাম।"

লোকজন ঘিরে ধরেছে শশীবাবুকে। একজন বলল, "কিন্তু আপনি যে মারা গেলেন।"

শশীবাবু হেসে বললেন, "ও তো সাজানো ব্যাপার।"

কবরেজ বললেন, "আর তান্ত্রিক। সেও কি সাজানো? আপনার যে নাড়ি বন্ধ ছিল, শ্বাস চলছিল না?"

শশীবাবু স্মিতহাস্যে বললেন, "তান্ত্রিক তো নয়াগঞ্জের জগা। যাত্রার দলে ভাল পার্ট করে। আর নাড়ি যে-কেউ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে দিতে পারে। সহজ প্রক্রিয়া আছে। আর শ্বাস? তুমি যখন আমার নাকের কাছে হাত দিলে, শুধু তখন আমি দমটা বন্ধ করে দিলাম।"

"কিন্তু এসব করলেন কেন? দিনু যে এত কাণ্ড করল?"

“দেখলাম, প্রয়োজন পড়লে তোমরা প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারো কি না! তাই হাতটাকেও তোমাদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করলাম। দেখলাম, নাঃ, তোমরা ততটা অপদার্থ হয়ে যাওনি সবাই। বেশির ভাগ যদিও দিনুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, তবু কয়েকজন যে রুখে দাঁড়িয়েছিল তাইতেই আমি খুশি। সমাজে সত্যিকারের সাহসী কয়েকজনই থাকে। তারা যদি গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে, তবে বাদবাকিরা তাদেরই অনুসরণ করে।”

“তা হলে এখন থেকে হাতটা আগের মতোই কাজ করবে তো?”

শশী গাঙ্গুলি একটু হাসলেন। বললেন, “এতদিন হাতের রহস্য তোমাদের বলিনি। আজ বলতে বাধা নেই। প্রায় ষাট বছর আগে আলাস্কায় এক রাতে আমি তুষারঝড়ে পড়ে যাই। তেমন ব্লিজার্ড বোধ হয় খুব কমই হয়। পথ হারিয়ে কোন প্রান্তরে গিয়ে যে পড়েছিলাম, কে জানে! দু হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না। বাতাসের সে কী শোঁ-শোঁ শব্দ। প্রাণ যায়। প্রাণপণে “বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছি । কিন্তু শুনবে কে? ভগবানকে ডাকা ছাড়া কিছুই করার ছিল না। যখন সব আশা জলাঞ্জলি দিয়ে ধীরে-ধীরে তুষারে কবরস্থ হয়ে যাচ্ছি, তখন কোথা থেকে একটা শক্তিমান হাত এসে আমাকে হাত ধরে তুলল, তারপর টেনে নিয়ে চলল। খানিক দূর নিয়ে গিয়ে সে একটা গোলাকার ঘরের মধ্যে আমাকে ঢুকিয়ে দিল। ঘরের মধ্যে বেশ গরম। আলো জ্বলছে। তখন দেখি, যে আমাকে এনেছে সে একটা কাটা হাত! আমি তো আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম। সেই সময়ে ঘরের ও পাশের একটা আবড়াল থেকে বিরাট চেহারার একজন লোক বেরিয়ে এল। অত বড় মানুষ দেখা যায় না। সাত ফুট লম্বা তো হবেই, তেমনই দশাসই চেহারা। আমার দিকে চেয়ে প্রথমে অংবং করে কী বলল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। খানিকক্ষণ আমার দিক চেয়ে থেকে হঠাৎ পরিষ্কার বাংলায় বলল, “কোথায় যেতে চাও। বলো, পৌঁছে দেব। ’ কিন্তু বাংলা বললেও সে কস্মিনকালেও বাঙালি নয়। আমি তখন তাকে আমার ঠিকানা বললাম। তখন হঠাৎ সেই গোল ঘরখানা শূন্যে উঠে চলতে শুরু করল। ব্লিজার্ডে তার কিছু হল না। আমাকে জায়গামতো যখন নামিয়ে দিল, তখন হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম.‘তুমি কোথাকার লোক? লোকটা বলল, “আন উনো সাম্রাজ্যের। সে অনেক দূর। আমি তখন বললাম, এই কাটা হাতটা কি ভূত? সে বলল, “না। এটা এক অগ্রণী বিজ্ঞানের অবদান আমি লোভে পড়ে বললাম, ‘আমাকে দেবে? লোকটা হেসে বলল, “নেবে? নাও । কিন্তু ওটা তোমাদের ক্ষতিও করতে পারে।”

শশীবাবু একটু দম নিয়ে তারপর বললেন, “আমি বললাম, কী ক্ষতি করবে? লোকটা বলল,‘তোমার কাজ করার ইচ্ছে কমে যাবে, অলস হয়ে পড়বে। তবু নাও। তবে মনে রেখো, যখন দেখবে তোমার আয়ু শেষ হয়ে আসছে, তখন এটা নষ্ট করে ফেলো। আমি তোমাকে দু রকম মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি। একটাতে এটাকে ক্রিয়াশীল করা যাবে। দ্বিতীয় মন্ত্রটা প্রয়োগ করবে এটাকে ধ্ববং করার সময়।’ আজ সেই সময় উপস্থিত হয়েছে।”

সবাই সমস্বরে বলে উঠল, "না! না! না! না!"

শশী গাঙ্গুলি বললেন, "হাতটাকে ধ্বংস করে ফেলাই উচিত কাজ। তোমাদের তাতে ভালই হবে। দুঃখ কোরো না। পরনির্ভরতা যত কমে যাবে, তোমরা ততই শক্তপোক্ত হবে।"

শশীবাবু হাত বাড়াতেই শূন্য থেকে হাতটা তাঁর হাতে নেমে এল। তিনি শেষবারের মতো হাতটার গায়ে একবার হাত বুলিয়ে আদর করলেন। তারপর বিড়বিড় করে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করলেন।

অমনই হাতটা শূন্যে উঠে একটা ডিগবাজি খেল। তারপর প্রচণ্ড শব্দে ফেটে শতখণ্ড হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর সেই টুকরোগুলো আবার ফটাস-ফটাস করে ফেটে আরও ছোট ছোট টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর সেই টুকরোগুলোও ফাটতে লাগল। ফাটতে-ফাটতে ক্রমে-ক্রমে অণু-পরমাণু হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। আর তার অস্তিত্ব রইল না।

জড়ো হওয়া মানুষজন হরষে-বিষাদে যে যার বাড়ি ফিরে গেল।

ফেরার পথে কবরেজমশাই জিজ্ঞেস করলেন, "শশীখুড়ো, আপনার অসুস্থতাটা না হয় সাজানো হতেই পারে, কিন্তু আমি নাড়ি ধরে বুঝতে পারলাম না কেন?"

"বলেছি তো, নাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া আছে। অভ্যাস করলেই হয়।"

"আর আপনার গলায় আঙুলের ছাপটা? সেটাও কি নকল?"

"বটেই তো! হাতটাকে বলেছিলুম, গলায় ছাপ ফেলতে। সে আলতোভাবে এমন সুন্দর ছাপ ফেলল যে, তুমি অবধি ধরতে পারেনি।"

"ক্ষান্তমণি কি সবই জানত?"

"জানবে না? খুব জানত।"

কুঞ্জপুকুরে আজ ভরি আনন্দের দিন। হাতটা নেই বটে, কিন্তু শশী গাঙ্গুলির এই বেঁচে-ওঠায় গাঁয়ের লোক খুব খুশি খুশির আরও কারণ আছে। সদাশিব দারোগা এখন খুব তৎপরতার সঙ্গে গাঁয়ের শান্তিরক্ষা করছেন। চোর-গুণ্ডা-বদমাশরা আর ত্রিসীমানায় নেই। গাঁয়ের লোকেরা এখন সদা সতর্ক। চণ্ডীমণ্ডপে বিকেলবেলায় শশীবাবুকে একটা সংবর্ধনা দেওয়া হল। শশীবাবু অনেক স্মৃতিচারণ করে বললেন, "আমার আজ এই ভেবে খুব আনন্দ হচ্ছে যে, নন্দ কবিরাজের তেঁতো পাঁচনগুলো এখন আর খেতে হবে না।"

সবাই খুব হাততালি দিল ।

সদাশিব বললেন,"দেশে চোর-ডাকাতের প্রয়োজন আছে। তাতে লোক তৎপর আর সতর্ক হতে শেখে।"

সবাই হাততালি দিল ।

কবরেজমশাই বললেন,"পাঁচন অতি ভার জিনিস। আমি শশীখুড়োর জন্য চমৎকার একটা পাঁচন তৈরী করেছি। কাল থেকেই খাওয়াব। কারণ, তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের নিজেদের স্বার্থেই দরকার।"

ফের তুমুল হাততালি পড়ল।